সোনার বাঙলা
১

।। প্রথম খণ্ড : জল মাটি পাহাড় ।।

বেঙ্গল পাবলিশার্স ।। কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র, ১৩৬৩। আগস্ট, ১৯৫৬

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—অজিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও,
৭২।১, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট-শিল্পী :
খালেদ চৌধুরী

প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ :
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স
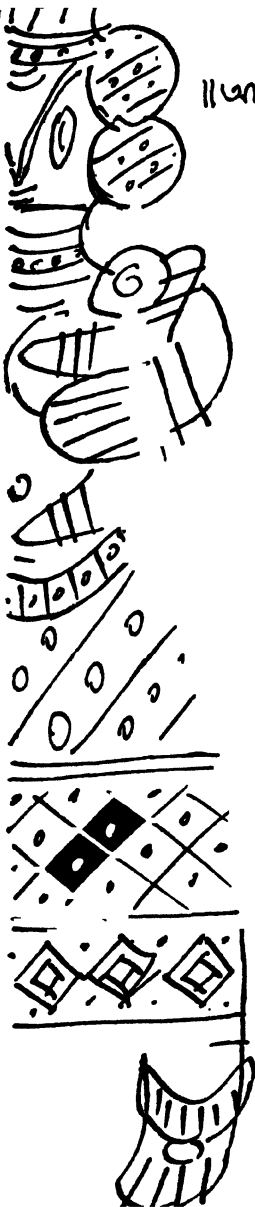
দু টাকা

।। আমার সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালবাসি ।।

সূচীপত্র

'আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। এই ভালোবাসা বাঙালীর জন্মগত। একই ভাষায় যারা কথা বলে, একই নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে একই অর্থনীতিক বিন্যাসে যারা জীবন-যাপন করে, একই সংস্কৃতির ধারায় যারা পরিপোষিত হয়— এমন এক মানুষের দল যখন তার মানবসত্তার স্পর্ধাকে ঘোষণা করে, তখনই সে ভালোবাসতে শুরু করে তার মাটিনদীবনের চৌহদ্দিকে ; তার নাম দেয় দেশ, বলে—আমার জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী।

মানুষ মমতা দিয়ে গড়ে তার দেশকে আর দেশ আবার গড়ে সেই মানুষকে। মানুষ আর মাটির এই দেওয়া-নেওয়ার টানাপোড়েনেই রচিত হয় জাতির পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর ইতিহাস— তার সাফল্যের দীপ্তি আর ব্যর্থতার কালিমা।

দাঁড়াক গিয়ে কোনো বাঙালী রাজপুতনার মরুভূমিতে কিংবা দক্ষিণ ভারতের এক মন্দিরের চত্বরে। দেখা যাবে কত

কৌতূহলী চোখ তার মুখের উপর। বলবে, বাঙ্গাল মুলুক্ কা আদমী। এমনি করে দেশ গড়ে মানুষের দেহ—তার চোখে মুখে শরীরের গাঁথুনিতে দেশের টান; এমনি করেই আমরা থাকি দেশের ভিতরে, দেশ থাকে আমাদের ভিতরে। তার ইতিহাস আমাদের মনের মাটি, তার ভূগোল দেহের কাঠামো।

যে ভূখণ্ডের নাম আজ বাঙলা, ভূপৃষ্ঠে তার অস্তিত্ব কম দিনের নয়। অতিদূর অতীতে তার ভৌগোলিক সীমারেখা কী ছিল? জানা যায় না। কিন্তু এটুকু আমরা জানি, অস্পষ্ট অতীতে যে মানবগোষ্ঠী এ ভূখণ্ডে বাস করত, ভাষা আর সংস্কৃতির বিশেষ ঐক্যবন্ধনে বিজড়িত 'বাঙালী' পরিচয় নিয়ে তখনো তারা আত্মপ্রকাশ করে নি। এই ঐক্যবন্ধন দানা বাঁধতে শুরু করে মধ্যযুগে।

ইতিহাসের আদিপর্বে যে বাঙলার চিত্র আমরা পাই সে বাঙলা পুণ্ড্র-গৌড়-সুহ্ম-রাঢ়-তাম্রলিপ্তি-সমতট-বঙ্গ-হরিকেল প্রভৃতি বহুতর রাষ্ট্রখণ্ডে বিভক্ত। সেই সব খণ্ডসীমা লুপ্ত করে বাঙলাদেশ 'বাঙ্গালা' নামে আত্মপ্রকাশ করল আকবরের আমলে।

বাঙলার ইতিহাসে বার বার রাষ্ট্রক্ষমতার হাতবদল হয়েছে, উত্থানপতন হয়েছে কত রাজবংশের। নানান সময়ে নানান শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে বাঙলার সীমারেখার হেরফের হয়েছে। রাজাদের রাজত্বে বাঙলার সীমারেখা ছিল এক রকম, বাদশাদের আমলে তার কিছুটা রদবদল হল। কিন্তু এ সমস্ত অদলবদল কোনো দিনও স্বাভাবিক সীমাকে ছাড়ায় নি, লঙ্ঘন করে নি। কিন্তু চূড়ান্ত খামখেয়ালিপনা করে দেশের সীমানানির্ধারণ দেখা দিল ইংরেজ রাজত্বে। খুব একটা স্বাভাবিক রীতি হল নদী বা পাহাড় বা
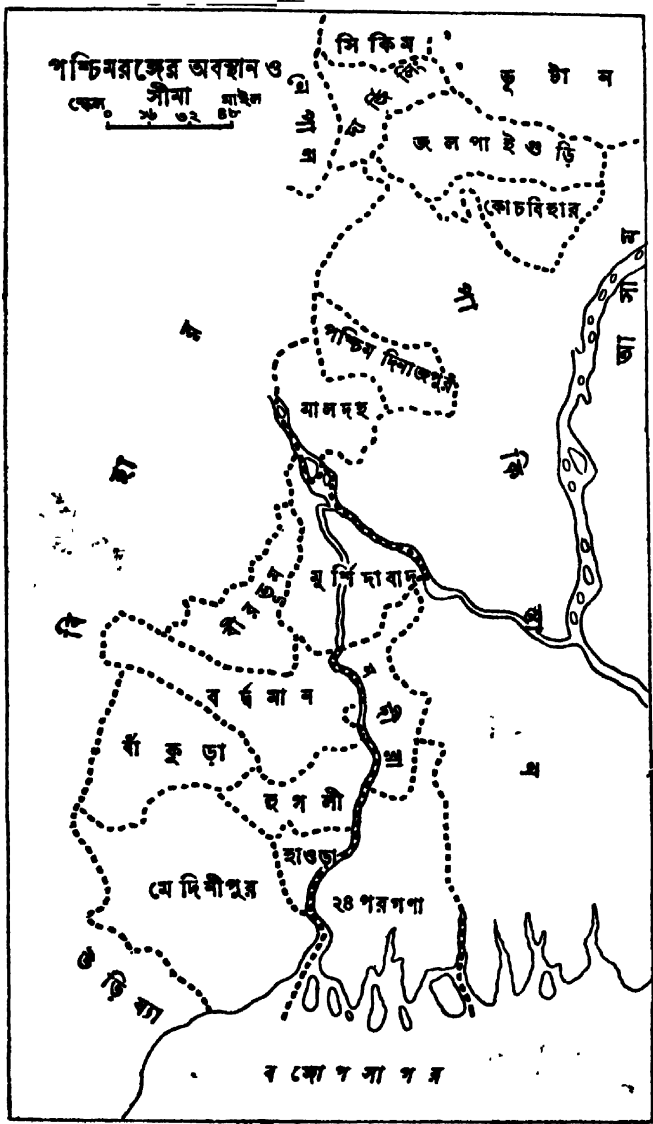
বনসীমা—এই রকম কোনো প্রকৃতিরচিত চিহ্ন দিয়ে তুই দেশের সীমাকে নির্দিষ্ট করা। কিন্তু নিছক প্রশাসনিক সুবিধের জন্যে ইংরেজ সে সব বিধিনিষেধ মানে নি। তাই কোথায় বাঙলার শেষ হল আর কোথায় বিহারের হল আরম্ভ, কোথায় শেষ হল মেদিনীপুর আর শুরু হল উড়িষ্যা, তা বোঝবার উপায় নেই। দেশের সীমা হয়ে রইল একান্ত কৃত্রিম। বিরোধের বীজ উপ্ত হয়ে রইল।

আমাদের "দক্ষিণে সুন্দরবন, উত্তরে টেরাই"।

ইংরেজ আমলে বাঙলার উত্তর প্রান্তে ছিল হিমালয় পর্বতশ্রেণী: পর্বতের উপত্যকায় নেপাল, ভুটান আর সিকিম রাজ্য। দক্ষিণে গর্জনমুখর বঙ্গোপসাগর: উপকূলে নোয়াখালি-চট্টগ্রামের শ্যামল বনমেখলা। পুবে আসাম, গারো-খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহাড়ের ধূসর দেওয়াল আর পশ্চিমে বিহার আর উড়িষ্যার বনভূমি। এই ছিল ইংরেজ আমলের বাঙলা—৫টা বিভাগে ভাগ করা ২৮টা জেলার বাঙলা। ৮৫ হাজার বর্গমাইল নিয়ে ব্যাপ্ত এই ভূমিখণ্ড ঐতিহাসিক কালের বাঙালীর যজ্ঞভূমি, তার কর্মকৃতির পীঠস্থান, স্বপ্নের অমরাবতী।

তারপর ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭। স্বাধীনতার মূল্য দিতে হল বাঙলাকে ভাগ করে। সেই ভাগ আরো স্বেচ্ছাচারী, আরো আপত্তিকর; সে নীতিহীন ভাগবাঁটোয়ারার কোনো বৈজ্ঞানিক রীতি নেই। আর তার ফলে পৌনে একত্রিশ হাজার বর্গমাইল নিয়ে সৃষ্ট হয়েছে স্বাধীন ও বিভক্ত বাঙলা—আমাদের পশ্চিম বাঙলা। অন্য ভাগ হল পূর্ব বাঙলা—পাকিস্তান-রাষ্ট্রের পূর্বখণ্ড।

দিনাজপুর জেলার উত্তরখণ্ড যুক্ত হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে। ফলে পশ্চিম বাঙলার ভৌগোলিক অখণ্ডতা নেই। পশ্চিম বাঙলা আজ দুটো ভাগে বিভক্ত, উত্তর ভাগ, আর দক্ষিণ ভাগ। উত্তর ভাগে দার্জিলিঙ, জলপাইগুড়ি আর কোচবিহার জেলা। এর উত্তর সীমায় তুষারমৌলি হিমালয়। সেখানে অবিরাম আলো-আঁধারের খেলা, মেঘ-কুয়াশার মন-দেওয়া-নেওয়া। সিকিম থেকে নেমেছে তিস্তা নদী, ভাগ করেছে দার্জিলিঙকে—এক পাশে তার একদা বনাকীর্ণ কালিম্পঙ, অন্যদিকে ঘুম পাহাড়ে দার্জিলিঙ আর কার্শিয়াঙ। ৬,০০০ থেকে ১০,০০০ ফুট উঁচু পাহাড়, তার সর্বাঙ্গে ঘন সবুজ বনের আলোয়ান। ৭,৪৩২ ফুট উঁচুতে দার্জিলিঙ শহর ভ্রমণবিলাসীর স্বর্গ। পিছনে মাইমন পর্বত, দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘা। এই উত্তর খণ্ডের উত্তর সীমায় রাংপো নদী আর সিঙ্গুলা পাহাড়; জলপাইগুড়ি আর আসামের ভিতর দিয়ে প্রবহমান সংকোশ নদী। দার্জিলিঙ আর নেপালের মধ্যবর্তী মেচি নদী হল পুবে আর পশ্চিমে। দক্ষিণে বিহারের পূর্ণিয়া জেলা আর পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুর। এই হল পশ্চিম বাঙলার স্বতন্ত্র ভৌগোলিক-বিশেষত্ব-মণ্ডিত উত্তর খণ্ড, যার আয়তন পাঁচ হাজার বর্গমাইল।

দক্ষিণ খণ্ডের উত্তরে পূর্ব-পাকিস্তানের দিনাজপুর, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পুবে পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিমে বিহার-উড়িষ্যা। এখন পশ্চিম বাঙলার ভিতর ২টো বিভাগ, ১৫টা জেলা—বর্ধমান বিভাগ আর প্রেসিডেন্সি বিভাগ; অখণ্ডিত বর্ধমান বিভাগের ভিতর পড়ল বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী আর হাওড়া—এই ৬টা জেলা। প্রেসিডেন্সির ভিতর পড়ছে,—২৪ পরগনা, কলকাতা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর,

কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিঙ—এই ৯টা জেলা। দেশ-বিভাগের ফলে ২৪ পরগনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ৩১৯.৮ বর্গমাইল জমি। নদীয়ার সীমার অদলবদল হয়ে নতুন নদীয়া হল। তার আয়তন আগের অর্ধেকের একটু বেশী। কয়েকটা মৌজার বিরোধ নিয়েও মুর্শিদাবাদ প্রায় অক্ষত। মালদহ আর জলপাইগুড়িকে হারাতে হয়েছে ৬০০ ও ৭০০ বর্গমাইল জমি ;—প্রত্যেকের গিয়েছে ৫টি করে থানা। খর্ব হয়েছে দিনাজপুর। ইতিমধ্যে কোচবিহার হয়েছে পশ্চিম বাঙলার অন্তর্ভুক্ত।

পশ্চিম বাঙলার সঠিক আয়তন নিয়ে মতভেদ আছে। সার্ভেয়র-জেনারেলের মতে পশ্চিম বাঙলার আয়তন হল ৩০,৭৭৫.৩ বর্গমাইল আর ডাইরেক্টর অফ ল্যাণ্ড রেকর্ডস বলেন পশ্চিম বাঙলার আয়তন হল ৩১,০৪৪.৩ বর্গমাইল। ১৫টা জেলায় বিভক্ত পশ্চিম বাঙলায় ৪৫টা মহকুমা ; ২৮০টা থানা। পশ্চিম বাঙলার মোট জনসংখ্যা ২,৪৮,১০,৩০৮। জেলা হিসাবে ধরতে গেলে :

জেলা	জনসংখ্যা	আয়তন (বর্গমাইল)
২৪ পরগনা	৪৬,০৯,৩০৯	৫,৬৩৯.৯
মেদিনীপুর	৩৩,৫৯,০০২	৫,২৫৩.১
কলকাতা	২৫,৪৮,৬৭৭	৩২.২
বর্ধমান	২১,৯১,৬৬৭	২,৭০৫.৪
মুর্শিদাবাদ	১৭,১৫,৭৫৯	২,০৭২.১
হাওড়া	১৬,১১,৩৭৩	৫৬০.১
হুগলী	১৫,৫৪,৩২০	১,২০৮.৪
বাঁকুড়া	১৩,১৯,২৫৯	২,৬৪৬.৯
নদীয়া	১১,৪৪,৯২৪	১,৫০৯.০
বীরভূম	১০,৬৬,৮৮৯	১,৭৪২.০
মালদহ	৯,৩৭,৫৮০	১,৩৯২.০

জেলা	জনসংখ্যা	আয়তন (বর্গমাইল)
জলপাইগুড়ি	৯,১৪,৫৩৮	২,৩৪৭·৪
পশ্চিম দিনাজপুর	৭,২০,৫৭৩	১,৩৮৫·৫
কোচবিহার	৬,৭১,১৫৯	১,৩২২·৬
দার্জিলিঙ	৪,৪৫,২৬০	১,১৯৯·৭

১৯৪১ সালের লোকগণনা থেকে জানতে পারা যায় যে বাঙলার জনসংখ্যা ছিল ২৯,৭৩,০১৩ জন। ১৯৫১ সালে জনসংখ্যা বেড়ে হল ২,৪৮,১০,৩০৮। এই দশ বছরে জনবৃদ্ধির গড় হার হল ১২·৭। তার ভিতর বাস্তুহারা আছে, যাদের সংখ্যা হবে ২০,৯৯,০৭১ জন। ভারতবর্ষে উদ্বাস্তুর চাপ পশ্চিম বাঙলায় সবচেয়ে বেশী। প্রতি ১২ জনে ১ জন উদ্বাস্তু। এখানে প্রতি বর্গমাইলে ৮০৬ জন লোক বাস করে।

পশ্চিম বাঙলার একটা লক্ষ্যনীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যাল্পতা। প্রতি হাজার পুরুষে ৮৫৯ জন নারী। সমস্ত জনসংখ্যার প্রায় একচতুর্থাংশ শহরবাসী। লিখতে-পড়তে-জানা লোকের হার ২৪·৫। শিক্ষার ক্ষেত্রে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন সবচেয়ে অগ্রগামী। পরিবারের দিক থেকে দেখতে গেলে, একান্নবর্তী পরিবার এখনো অটুট। প্রতি পরিবারের গড় লোকসংখ্যা হল ৪·৯।

গ্রামাঞ্চলে বসতির ঘনতা গড়ে ৬১০। কিন্তু হিসেব করে দেখা গিয়েছে, গ্রামাঞ্চলে ঘনতা যেই ৫০০ হল, অমনি জনসংখ্যায় অস্থিরতা দেখা যায়। মানুষ তখন ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে। চাষবাস করে বেঁচে থাকা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। যেখানে আহার জুটবে সেখানেই তারা ছড়িয়ে পড়বে। কেউ ছুটে যায় ডুয়ার্সে চায়ের বাগানে; আসানসোলের কয়লাকুঠিতে

জড়ো হয় কেউ কেউ; কেউ আবার ছুটে আসে হাওড়া-হুগলী-কলকাতা-২৪ পরগনার অলিতে গলিতে কারখানায়। তাই শিল্পাঞ্চলে বসতির ঘনতা রাজ্যের গড়কে ছাড়িয়ে চলে যায়। কলকাতার গড় ওঠে প্রতি বর্গমাইলে ৭৮,৮৫৮ জন।

পশ্চিম বাঙলার মোট জনসংখ্যার এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ লোক কৃষিজীবী। অর্থাৎ চাষবাসের উপর নির্ভর, এমন লোক শতকরা ৫৭·২। আর বাকি লোক, অর্থাৎ ৪২·৮% অ-কৃষিজীবী। এই কৃষিজীবীদের ভিতর শতকরা ৭৪ জন ভরণপোষণের জন্য অন্য লোকের মুখাপেক্ষী। অ-কৃষিজীবীদের শতকরা ৬১ জন পরাশ্রয়ী। অ-কৃষিজীবীদের শতকরা ১৫·৩৬ জন শিল্পাশ্রয়ী, ৯·৩২ জন ব্যাবসাদার। চাকরিবাকরি করে জীবনধারণ করে এমন লোক শতকরা ১৫·০৬। এ রাজ্যে শতকরা ৬১ জন লোক বেকার।

ভূমিপ্রকৃতি

পশ্চিম বাঙলা রূপবৈচিত্র্যময়ী। তার স্থানচিত্র কোথাও একঘেয়ে নয়—নানান রঙ আর নকশার সতরঞ্জ যেন। সবটা মিলিয়ে একটা অখণ্ড সমগ্র সৃষ্টি।

বাঙলা আমাদের কোথাও রুক্ষ—ধূ-ধূ পিঙ্গল প্রান্তরে মধ্যদিনের হীরকরৌদ্রে অগ্নিময়ী। কোথাও খালবিলনালার মধ্যে কশ্‌ঝাড়-আশশ্যাওড়া-কাশের বনে তার তন্বী কিশোরী-মূর্তি—অঙ্গে শ্যামল বসন, চোখে স্নিগ্ধ দীঘির শান্তি, কণ্ঠে ভাটিয়ালির সুরতরঙ্গ। কোথাও পাথুরে সৌন্দর্যের মধ্যে তার তনুতরঙ্গের উচ্ছ্বাস, মনে জাগায় নিবিড় অরণ্যের গভীর গাম্ভীর্য। কোমলে কঠোরে, মুখর গর্জনে নীরব শান্তিতে বিচিত্র এই বাঙলার রূপে আমরা সম্মোহিত, আমরা উজ্জীবিত।

প্রাকৃতিক ও মাটির গঠন হিসাবে পশ্চিম বাঙলাকে মোটামুটি দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হল পার্বত্য অঞ্চল, হিমালয়ের জ্ঞাতি; অন্যটি সমতল ভূমি। পশ্চিম বাঙলার উত্তর খণ্ডকে বলতে হয় পার্বত্য অঞ্চল। দার্জিলিঙ, জলপাইগুড়ি আর কোচবিহার নিয়ে গঠিত এই পার্বত্য অঞ্চল আয়তনে প্রায় পাঁচ হাজার বর্গ-মাইল। মাথার উপর হিমালয় পর্বত। তাই এর বনভূমির গঠন হিমালয়ের মতো। ৩,০০০ ফিট থেকে ৯,০০০ ফিট পর্ণমোচী গাছের জঙ্গল। তার মধ্যে ওক, ম্যাপ্‌ল, পপলার। ৯,০০০ ফিট থেকে ১২,০০০ ফিট পর্যন্ত সরলবর্গীয় অরণ্য। এ অঞ্চলের গাছের ছাল

পশ্চিমবঙ্গের ভূপ্রকৃতি
স্কেল ০ ১৬ ৩২ ৪৮ মাইল
পার্বত্যভূমি
উচ্চ সমভূমি
সমভূমি
তরাই অঞ্চল
তরাই অঞ্চল
গঙ্গা নদী
ব ঙ্গো প সা গ র
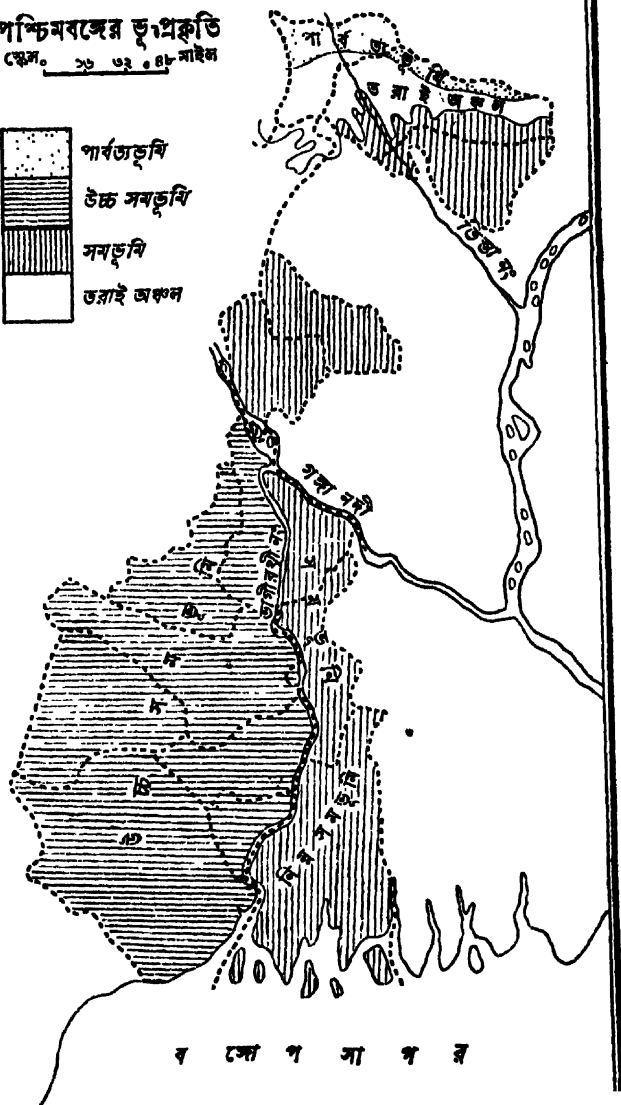
ডুমো-ডুমো। অরণ্য খুব গভীর, কিন্তু অপ্রবেশ্য নয় মোটেই। পাইন, ফার, বার্চ, সিডার গাছ এখানে প্রধান। হিমালয়ের তলা থেকে যে অরণ্য-অঞ্চল আরম্ভ হয়েছে তার নাম তরাই। শিলিগুড়ি মহকুমা ও কার্শিয়াঙের পূর্বাংশ নিয়ে তরাই। আর কোচবিহারের উত্তর, কালিমপঙ, ভুটান এবং তিস্তা ও সংকোশের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বলা হয় ডুয়ার্স। ভূমিপ্রকৃতির দিক থেকে তরাই এবং ডুয়ার্স অভিন্ন। এখানে অনেক মালভূমি। এই মালভূমিতে চা-বাগান। এদিকে পাহাড়, ধোঁয়াটে কুয়াশা। নেমে আসছে ঝোরা, পাগলের মতো হাসছে। পিঠে চুপড়ি বেঁধে মাঠে চায়ের শ্রমিক। মাঝে মাঝে পাহাড়ে যখন বৃষ্টি হয়, তখন মত্ত হয় নদী। ধরাবাঁধা পথে চলতে পারে না। আপন খেয়ালে খুশিতে নিজের পথ করে ছুটে যায়। এই করেই হয়েছে তিস্তার ভাঙা-গড়া, পথ-বদল।

জলপাইগুড়ির প্রায় সবটাই বেলে দোআঁশ মাটি। তিস্তা আর জলঢাকার মাঝখানের মাটি শক্ত, কালো। এই মাটি তামাকের পক্ষে খুব ভালো। দার্জিলিঙের মাটি হালকা বেলে। কোথাও কোথাও মাটি কালো। কালো মাটি শস্যের পক্ষে খুব উপযোগী। লাল এবং সাদা মাটিও দেখতে পাওয়া যায়। কোচবিহারের মাটি যদিও পলিগঠিত, কিন্তু বেলে। এ মাটিতে জল দাঁড়ায় না। চাষ করা খুব সহজসাধ্য এখানে।

সমতল পশ্চিম বাঙলাকে আবার প্রকৃতির বৈচিত্র্যের দিক থেকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। কারণ তারা এক গোত্রের নয়। সুন্দরবনের বন আর বীরভূমের প্রান্তরের তফাতটাই চোখে পড়ে বেশী। মিলটা ভিতরের, আত্মার। এই সমতল ভূমি তিন ভাগে বিভক্ত। ভাগীরথী এই ভাগটা করে দিয়েছে। এই ভাগের এক

দিকে পড়ল পশ্চিম দিনাজপুর-মালদহের অংশ। এর আয়তন হল ২,৭৯৩ বর্গমাইল। এই হল বারেন্দ্র ভূমি। মহানন্দা নদী মালদহকে দু ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। এই দুই ভাগের ভূমি-প্রকৃতির পার্থক্য প্রচুর। এই হল লাল মাটির দেশ। মাটির মাথায় কাঁকরের দানা সূর্যে মণির মতো জ্বলে। বিরলবসতি গ্রাম, মাঝে মাঝে শাল আর বাঁশের ঝোপ। প্রকৃতি এখানে যেন অপ্রসন্ন—তাই দিগদিগন্তজোড়া লাল মাটির স্তব্ধ তরঙ্গ। শুকনো পথঘাট, জল নেই। যখন আমনের সময় আসে, মাটির রূপ বদলায় একমাত্র তখন। মহানন্দা আর কালিন্দীর মাঝামাঝি ঢাল বন্যায় ভেসে যায়। এরই দক্ষিণ দিকে মালদহের প্রসিদ্ধ আমবাগান। মালদহের প্রায় সবটাই পলিসৃষ্ট ভূমি। ফ্যাকাশে লালচে রঙের মাটি জলে দেখায় পীতাভ। মহানন্দার পশ্চিমদিকের নিম্নভূমি আধুনিক পলিসৃষ্ট ভূমি। উর্বরতার দিক থেকে মালদহের দক্ষিণ দিক অনেক মূল্যবান। পশ্চিম দিনাজপুরের মাটি ছাই-রঙা, ফিকে, দো-আঁশ। দক্ষিণ দিকে খিয়র মাটি। খিয়র মাটিতে একটা ফলন হয়। কিন্তু মাটি যেখানে শক্ত আর লাল হয়ে উঠেছে সেখানে একমাত্র আমন ছাড়া আর কিছু হয় না।

একদিকে ভাগীরথী অন্যদিকে সাঁওতাল পরগনা আর একদিকে ময়ুরভঞ্জ নিয়ে যে বিরাট এলাকা পড়ে রয়েছে তার নাম রাঢ় অঞ্চল। এর ভিতরে এসে পড়েছে মুর্শিদাবাদের এক দিক, নদীয়ার কিছুটা এবং মেদিনীপুরের বেশ বড়ো পশ্চিমাংশ। অখণ্ড আকারে আছে বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম। সমগ্র পশ্চিম বাঙলার প্রায় অর্ধেকটা এই ভৌগোলিক ভাগের ভিতর পড়ে। ধর্মঠাকুরের 'থান' এই রাঢ় দেশ নানা কারণে বাঙলা দেশে প্রসিদ্ধ।

এ অঞ্চলটা যেন ছোটনাগপুরের পাহাড়ী অঞ্চলের সমগোত্রীয়। অথচ ঠিক পাহাড় বলতে যা বোঝায় তা এখানে পাওয়া যাবে না। এখানে মাটি উঁচু এবং লাল। পূর্বভাগ গঠিত হয়েছে পলিমাটি দিয়ে। পশ্চিম ভাগে এসেছে গণ্ডোয়ানা পর্যায়ের মালভূমির অংশ। পণ্ডিতেরা বলেন, এমন একদিন ছিল যখন ভারতের উত্তরে নগাধিরাজ হিমালয়ের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তখন দাক্ষিণাত্য থেকে আরম্ভ করে আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া নিয়ে একটা মহাদেশ ছিল যার নাম গণ্ডোয়ানা। কালক্রমে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে সে মহাদেশ টুকরো-টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেছে। রাঢ়ের ভিতর সেই গণ্ডোয়ানা মালভূমির প্রচ্ছন্ন সঞ্চার। এই পর্যায়ের পর্বতের দান হচ্ছে তার খনিসম্পদ। তাই মোর নদীর উত্তর দিকের টাংপুলি খনি থেকে রানীগঞ্জ-আসানসোল নিয়ে বাঁকুড়ার মেজিয়া ও বিহারীনাথ পাহাড় পর্যন্ত পশ্চিম বাঙলার খনি-অঞ্চল ও শিল্প-ভবন। বীরভূম জেলায় পাওয়া যাবে গ্রানিট শিলা। বাঁকুড়া-মেদিনীপুর ও মানভূমের যোগপথে গ্রানিট শিলাস্তর। বর্ধমান জেলার মাটি অনেকটা সিংভূম-মানভূমের মতো। এই মাটিতে এক দিকে যেমন ছোট নাগপুরের পাহাড়ী নদীর পলিমাটি, অন্যদিকে আবার বিন্ধ্য অঞ্চলের মতো লাল মোটা-মোটা বালি। দ্বারকেশ্বর, অজয় আর দামোদরের খাতের ধারে এই বালির অফুরন্ত ভাণ্ডার। লাল মাটিতে চাষ-আবাদ করা বেশ শক্ত। বৃষ্টির পরে এ মাটি হয় পাথরের মতো কঠিন। এ মাটিতে লোহা আর ফসফরাস বেশী। কিন্তু আবাদী অঞ্চলের মাটি কাদা-কাদা। নদীর পলি দিয়ে গড়া সব খেত প্রায় চরের উপর। বাদামী রঙের এঁটেল মাটি দেখতে পাওয়া যায় বীরভূমে—নদীর খাতে বা

প্লাবনে যখন পলি পড়ে; চাষের জন্য সে জমি হয় সবচেয়ে লোভনীয়। বীরভূমের মাটিই মূর্তি গড়বার উপযোগী—বাঁকুড়ার সবটাই দো-আঁশ বেলে আর কাঁকর-প্রধান মাটি। এখানকার নিম্নভূমি এবং উপত্যকার মাটি সবচেয়ে উর্বর। মেদিনীপুর পলি-গঠিত জেলা। এখানকার মাটি এঁটেল এবং দো-আঁশ। মাটির রঙ লালচে। মুর্শিদাবাদের যে অংশ রাঢ়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তা বহু হাজামজা বিলখালে পূর্ণ। এ অঞ্চলে আখ, তুঁত, তামাক, আলু ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। মেদিনীপুর থেকে এগুতে আরম্ভ করলে জেলার রঙ-বদল চোখে পড়ে। ঝাড়গ্রামের কাছে মনে হয় এ বুঝি ছোট নাগপুরের একটা অংশ। আদিবাসীর পাড়া ফেলে পুব দিকে যেতে যেতে আসবে উড়িষ্যার আমেজ। তার কিছুটা দূরে বঙ্গোপসাগরের নীল জল।

এর পর ভাগীরথীর সমভূমি অঞ্চল। সুন্দরবন পড়ে এই অঞ্চলের ভিতর। সৃষ্টির দিক থেকে এ অংশটা অপেক্ষাকৃত নতুন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলেছে ভাঙা-গড়া, জয়-পরাজয়। বিপুল পলি-মাটি পড়ে এ অঞ্চল যেমন দিনে দিনে হয়েছে মহত্তর সম্ভাবনায় পূর্ণ, অন্য দিকে তেমন নানা কারণে জল-নিকাশের অব্যবস্থার ফলে এ অঞ্চল হয়েছে বিল আর ম্যালেরিয়ায় মুমূর্ষু। জন্ম-মৃত্যুর রহস্যের বাসা এর বনবাদাড়ে, ঝোপেঝাড়ে। এই বিপুল নবসৃষ্ট পলিমাটি-অঞ্চল শিল্পে সমৃদ্ধ। হুগলী নদীর ধার থেকে দুই পাশে হাজার হাজার চোঙা দিনরাত ধোঁয়া উগরে আকাশকে করে তুলেছে কালো পাথর। তার কোলে নতুন সভ্যতার পুণ্যপীঠ কলকাতা। হুগলী, হাওড়া, কলকাতা আর চব্বিশ পরগনা একদিকে যেমন অখণ্ড ভাবে এসেছে এই অঞ্চলে, অন্য দিকে এসেছে খণ্ডিত ভাবে

মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং মেদিনীপুর। মুর্শিদাবাদের কিছুটা অংশ নবসৃষ্ট ভূমি। একদিন ভাগীরথীর খাদ ভরাট হতে আরম্ভ করল। গঙ্গা তখন পুব দিকে বাঁক নিল। ইচ্ছামতী, জলঙ্গী আর মাথাভাঙা দিয়ে গঙ্গার জল বইতে আরম্ভ করল। কিন্তু পুল বেঁধে স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হয়েছে। আজ মুর্শিদাবাদ, নদীয়া আর চব্বিশ পরগনা হাজামজা বিলে থৈ-থৈ করছে। মুর্শিদাবাদের যে অংশটা বগড়ি নামে পরিচিত সেটা প্লাবনের জমি। পলিমাটি পড়ে এখানকার জমি উর্বর। আউশ আর পাট এখানে প্রধান শস্য। অন্যদিকে নদীয়ার জমি প্লাবনে ভাসে না, পলিও পড়ে না। এখানে হালকা বেলে আর দো-আঁশ মাটি। হুগলীর প্রায় সবটাই নতুন পলির জমি। এই পলিমাটির স্তর ৫ ফুট থেকে ১০ ফুট গভীর। তলায় এঁটেল মাটি। দামোদরের পলি হালকা, সরস্বতীর মাটি কাদা-কাদা। হাওড়ার মাটি অনেকটা হুগলীর মতো ;—পলিমাটি, তলায় এঁটেল মাটির স্তর, জলাভূমিতে কাদা-কাদা মাটি। কলকাতার মাটি কিছুটা খুঁড়লে কাদার সঙ্গে কাঁকর দেখতে পাওয়া যায়। এখানে টিউব ওয়েল বসানোর সময় প্রাচীন কালের প্রাণীর হাড় দেখতে পাওয়া গিয়েছে। শিয়ালদা অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে সুন্দরী গাছের গুঁড়ি। এগুলো ছিল প্রায় ত্রিশ হাত মাটির গভীরে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কলকাতার উচ্চতা মাত্র ২১ ফুট। চব্বিশ পরগনা আরো নীচু। এখানকার মাটি দো-আঁশ, বেলে আর নোনতা। নোনা মাটি সব সময় ভিজে-ভিজে। চাষের জন্য জমি যতটা শুকোনো দরকার এখনকার জমি তা হয় না। কিন্তু চব্বিশ পরগনার মাটির তলায় পাথুরে মাটি নেই। ১৮৫৯ সালে ক্যানিং অঞ্চলে পুকুর কাটার সময় মাটির তলায়

দাঁড়ানো ৪০টা সুন্দরী গাছ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। গাছগুলো ছিল ত্রিশ গজ পরিধির ভিতর দশ ফুট মাটির তলায়। কিন্তু কাঠের কোন ক্ষতি হয় নি তখনো। আবার এ অঞ্চল একদিন যে সমৃদ্ধ ছিল তারও প্রমাণ আছে। জয়নগর থানার কাশীপুর গ্রামে আনুমানিক ষষ্ঠ শতকের সূর্য-মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। ডায়মণ্ডহারবারের ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে পাওয়া গিয়েছে লক্ষ্মণ সেনের পট্টোলি। কালীঘাটে পাওয়া গিয়েছে গুপ্তযুগের মুদ্রা আর খাড়ি পরগনায় অসংখ্য পাথরের মূর্তি। চব্বিশ পরগনা যদিও পশ্চিম বাঙলার সবচেয়ে বড়ো জেলা কিন্তু এর এক-তৃতীয়াংশ সুন্দরবনের বনাঞ্চল। সুন্দরী আর হিন্তালের জড়াজড়ি বনের মধ্যে এসে সহস্রমুখী নদী হাত বাড়িয়ে সাগরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন দ্বীপ। এর এক দিকে বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়ের থান, অন্যদিকে কুমিরের দেবতা কালুরায়ের রাজত্ব। যখন জোয়ার আসে, ভাসতে থাকে সুন্দরবন। দাঁড়ায় এক-কোমর জল। তবু চাষ-বাস হয়। এক ধরনের সাদাটে মাটি আছে এখানে। খুব হালকা মাটি, কিন্তু বড় নোনা। উলুখড় ছাড়া আর কিছু হয় না। বর্ষায় নোনা ধুয়ে গেলে চাষ করা যায়, তাও অতি সামান্য। আর ঢালু জমি ফসলের উপযুক্ত হলেও প্লাবনের ভয় সব সময়। এখানে মোটা ধান জন্মায় সামান্য।

ঋতুচক্র

পশ্চিম বাঙলার ঋতুবৈচিত্র্য, তার জলবায়ুর নানা রূপ বড়ো মমতায় ধরা দিয়েছে বাঙালীর লোকগাথায়, বাঙালীর সাহিত্যে।

এ ঋতুচক্রের শুরুতেই এসে বসে রুদ্র বৈশাখ, রোদ্দুরের ধুনি জ্বালিয়ে। মাটির রস নিঃশেষে শুষে নেয় নিষ্ঠুর বৈশাখ। জমিন হয় ফাটা-ফাটা—বাঙলার কৃষকের আকুলতা গান হয়ে ওঠে আকাশে : 'আল্লা মেঘ দে, পানি দে'।

তারপর একদিন সত্যিই পুঞ্জকৃষ্ণ মেঘের ঝাপট এসে লাগে বনবনান্তে। বর্ষার প্রথম তীব্র বর্ষণে নেতিয়ে পড়ে মাটি, সোঁদা গন্ধে নেশা ধরে। চাষীর ঝি চাষীর বৌ ব্রত করতে বসে, দল বেঁধে গান গেয়ে খেতে বীজ ছড়ায় চাষী। তারপর বৃষ্টি। বাঙলার বৃষ্টি। রাতদিন রিমঝিম ঝিমঝিম বৃষ্টি। বহুদিনের ভুলে-যাওয়া পদাবলীর গানের মতো আশ্চর্য ধ্বনির পুঞ্জ। আর আকাশে রাত্রিদিন আচ্ছন্ন করে ঘনঘোর সজল মেঘের পুঞ্জ।

তারপর আকাশে অন্য কিসের সাড়া জাগে, অন্য কিছুর আনাগোনা। ফুটে ওঠে শুভ্র কাশের গুচ্ছ, দুলে ওঠে ধানের সোনালি গুচ্ছ। শরৎ আসে। আসে নীল আকাশে হালকা মেঘের ভেলায় উধাও মুক্তি।

হেমন্ত আসে—রানীর মতো। কুঁড়েঘরের রাজেন্দ্রাণী নতুন করে সাজায় লক্ষ্মীর ঝাঁপি, গোলায় দেয় প্রদীপ।

শীত আসে। বাঙলার শীত কিন্তু ভয়ের নয়, ভরপুরের। চাষী-বৌ ছড়া কেটে পৌষ আগলিয়ে বলে, এসো পৌষ, যেও না।

পৌষ তবু যায়, আর পথ করে দিয়ে যায় বসন্তের জন্যে, জীবনের জন্যে।

বাঙালীর হৃদয়ের মমতায় অভিষিক্ত এই যে বাঙলার ঋতুচক্র, বাঙলার মানুষের গানে গাথায় কথায় যার আনন্দরূপ মুকুরিত,—তথ্যসার বস্তুগত বিশ্লেষণে এ ঋতুচক্রের কী রূপ ধরা পড়ে দেখি।

আবহবিজ্ঞানী বলবেন, পশ্চিম বাঙলার গ্রীষ্ম প্রখর তাপের গ্রীষ্ম নয়। গুমোট গরম, আলস্য-আনা গরম এখানে। এটা হয় বাতাসে জলীয় বাষ্পের প্রভাবে। পশ্চিম বাঙলার বৃষ্টি একান্তই মৌশুমী বায়ুর দান। আষাঢ় থেকে বৃষ্টিপাত শুরু হয়। পার্বত্য অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশী। এই ফর্দটা থেকে সব কথা পরিষ্কার বোঝা যাবে—

জেলা	বৃষ্টিপাত	শীতকালের তাপ	গ্রীষ্মকালের তাপ
দার্জিলিঙ	১২৩	৪৪	৬০
জলপাইগুড়ি	১২২	৬৩	৮১
পশ্চিম দিনাজপুর	৭১	৬৩	৮৫
মালদহ	৫৬	×	×
বীরভূম	৫৭	×	×
বর্ধমান	৫৯	৭০	৮৭
বাঁকুড়া	৫৬	×	×
হুগলী	৫৬	×	×
হাওড়া	৫৯	×	×
মুর্শিদাবাদ	৫৭	৬৭	৮৫

জেলা	বৃষ্টিপাত	শীতকালের তাপ	গ্রীষ্মকালের তাপ
নদীয়া	৫৮	×	×
২৪ পরগনা ও কলকাতা	৬৩	৭০	৮৪
মেদিনীপুর	৫৯	৭০	৯১

এক কথায় বলা যায়, পশ্চিম বাঙলায় শীতকালে তাপ ৪৪° থেকে ৭০°-র ভিতর থাকে।

পার্বত্য অঞ্চলে বর্ষার প্রকোপ সবচেয়ে বেশী। এখানে গড়ে ১২২ ইঞ্চির বেশী বৃষ্টিপাত হয়। দার্জিলিঙে পৌষ মাস থেকে চৈত্র মাস অবধি শীতের প্রকোপ। প্রতি বছরই এখনকার তাপ হিমাঙ্কের নীচে নেমে যায়। এখানে গরমের সময় পড়ে বৈশাখ থেকে শ্রাবণ। তখন তাপ থাকে ৬০°। কিন্তু তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে কোচবিহার আর জলপাইগুড়ির নাম করতে হয় প্রথমে। এখানে বৃষ্টিপাতের ধারা পার্বত্য অঞ্চলের রীতি মেনে চলে। বক্সায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২১০ ইঞ্চি; এ রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি পড়ে ওখানে। আর সবচেয়ে কম বৃষ্টি হয় বীরভূমের ময়ূরেশ্বরে। এখানে বছরে ৩৮ ইঞ্চি বৃষ্টি পড়ে। এত বেশী বৃষ্টি পড়ে বলেই উদ্ভিজ্জ সম্পদে কোচবিহার আর জলপাইগুড়ি জেলা এত সমৃদ্ধ।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় উচ্চ-বারিপাত-বিশিষ্ট মহাদেশীয় জলবায়ু কাজ করে। শীতকালে আকাশ পরিষ্কার; গরমকালে বেশ গরম—এই হল বৈশিষ্ট্য।

অল্প-বৃষ্টিপাত-কিন্তু-উচ্চতাপ-বিশিষ্ট গ্রীষ্মকালীন মহাদেশীয় জলবায়ুর ভিতর পড়ল বর্ধমান জেলার পশ্চিম দিক, মালদহ, বীরভূম, বাঁকুড়া আর মেদিনীপুরের এক অংশ। এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সামান্য; গরম দীর্ঘস্থায়ী।

মৃদু-শীত-গ্রীষ্ম-বিশিষ্ট মহাদেশীয় জলবায়ুর প্রভাবের ভিতর পড়ল মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হুগলী, হাওড়া, বর্ধমানের পূর্বাংশ এবং ২৪ পরগনার উত্তরাংশ। এখানকার শীত-গ্রীষ্ম মৃদুভাবাপন্ন। এ সমস্ত অঞ্চল জুড়ে ম্যালেরিয়ার মহামারী।

সামুদ্রিক জলবায়ুর ভিতর পড়ল উপকূল অঞ্চলের ২৪ পরগনা আর মেদিনীপুরের দক্ষিণ দিক। বঙ্গোপসাগরের জলবায়ুতে আবহাওয়া এখানে সমভাবাপন্ন।

বাঙলার নদী

মিশর নাকি নীলনদের দান।

আমরা বুক ভরে যাকে ভালোবাসি সেই বাঙলাও নদীর দান। বাঙলার ইতিহাস এক হিসাবে বাঙলার নদীর ইতিহাস।

নদী পাহাড়ী অঞ্চল থেকে বয়ে নিয়ে আসে পলিমাটি। কত বাঁক পেরিয়ে এসে সেই মাটি দেয় বাঙলার বুকে ঢেলে। ধীরে ধীরে, যুগযুগান্তের এই অবিরাম দানে গড়ে ওঠে অববাহিকা, মাথা তোলে কোমল রমণীয় নবসৃষ্ট ভূমি। গড়ে ওঠে দেশ—নদীমাতৃক বাঙলাদেশ।

খেয়ালী নদী আবার কখনো কখনো যায় খেপে। নিজের আদরে-যত্নে-গড়া দেশকে ভেঙেচুরে দিয়ে সে যাত্রা করে নতুন পথের সন্ধানে।

যখন সে বাঁধা পড়ে, নিজের খুশির আনন্দে নিজেই পরে শিকল —সেবায় মমতায় দু হাত ভরে-ভরে তুলে দেয় সোনালি শস্যের সম্ভার।

আবার কী হয়, কে জানে! পথ বদল করে নদী। ভরপুর শস্যের ভাণ্ডার শূন্য, মুখর জনপদ জনহীনতায় ভয়ঙ্কর, সারিগানে চঞ্চল বন্দর নিশ্চল নীরব।

এমনি করে নদী কাড়ে। যখন কাড়ে তখন মানুষ রাগ করে তাকে বলে, সর্বনাশী কীর্তিনাশা রাক্ষসী! আবার নদী যখন দেয়, তখন তার ভালোবাসা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। মানুষ ভালোবেসে

তখন নদীর নাম রাখে, পদ্মাবতী, ইচ্ছামতী। আদর করে ডাকে, ময়ূরাক্ষী, চূর্নী, সুবর্ণরেখা। নদীর নামে বাঙালীর কবিকল্পনা হৃদয় খুলে দেয়।

পশ্চিম বাঙলার নদীর প্রকৃতি আপন বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। পশ্চিম বাঙলা পড়ে মৌশুমী অঞ্চলের ভিতর—বৃষ্টিবাদল এখানে বেশী। অববাহিকার জল সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া এর কাজ। কিন্তু পশ্চিম বাঙলার নদী সে দায়িত্ব পালন করতে পারে নি। পলিমাটি পড়ে ভরাট হয়ে যায় নদীর খাদ, জল থমকে দাঁড়ায়, সমুদ্রে গিয়ে পড়তে পারে না। এই বন্দী জলস্রোত থেকে সৃষ্টি হয়েছে হাজার হাজার বিল আর জলাজমি। মাথার উপর হিমালয় থাকলেও, পশ্চিম বাঙলার কোনো নদী ঠিক হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয় নি। পার্বত্য অঞ্চলে যে নদীগুলি আছে সেগুলো বেরিয়েছে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে। মহানন্দা আর মেচি ছাড়া পার্বত্য অঞ্চলের সব নদী গিয়েছে দক্ষিণ-পুবে, আর ছোটোনাগপুরের পাহাড়ী অঞ্চলে উৎপন্ন বর্ধমান বিভাগের সব নদী পড়েছে ভাগীরথীতে। এ সব নদীতে সারা বছর জল থাকে না। গ্রীষ্মের দিনে এরা শুকিয়ে যায়, আবার সামান্য বর্ষার পর দেখা যায় দুরন্ত খেয়ালী স্রোত। ঘণ্টা কয়েকের ভিতরই হয়তো দশ থেকে কুড়ি ফুট অবধি জল বেড়ে গেল। চাষবাসের দিক থেকেও নদীগুলো খুব বেশী সাহায্য করতে পারে না। খেতে যখন জল ঢালবার দরকার সবচেয়ে বেশী, তখনই দেখা যাবে নদীতে জল নেই। নৌকো করে বাণিজ্য করা এক রকমের অসম্ভব ব্যাপার। ওদিকে, মহানন্দা, রায়দক, মেচি পাথুরে মাটি খামচিয়ে নিয়ে আসছে, চরের বুকে ফাটল

পশ্চিমবঙ্গের নদ-নদী
স্কেল ০ ১৬ ৩২ ৪৮ মাইল
জলঢাকা নদী
তোর্সা নদী
তিস্তা নদী
ব্রহ্মপুত্র নদ
গঙ্গা নদী
ময়ূরাক্ষী নদ
অজয় নদী
দামোদর নদ
দ্বারকেশ্বর নদ
কাঁসাই নদ
চূর্ণী নদ
বিদ্যাধরী
ব ঙ্গো প সা গ র
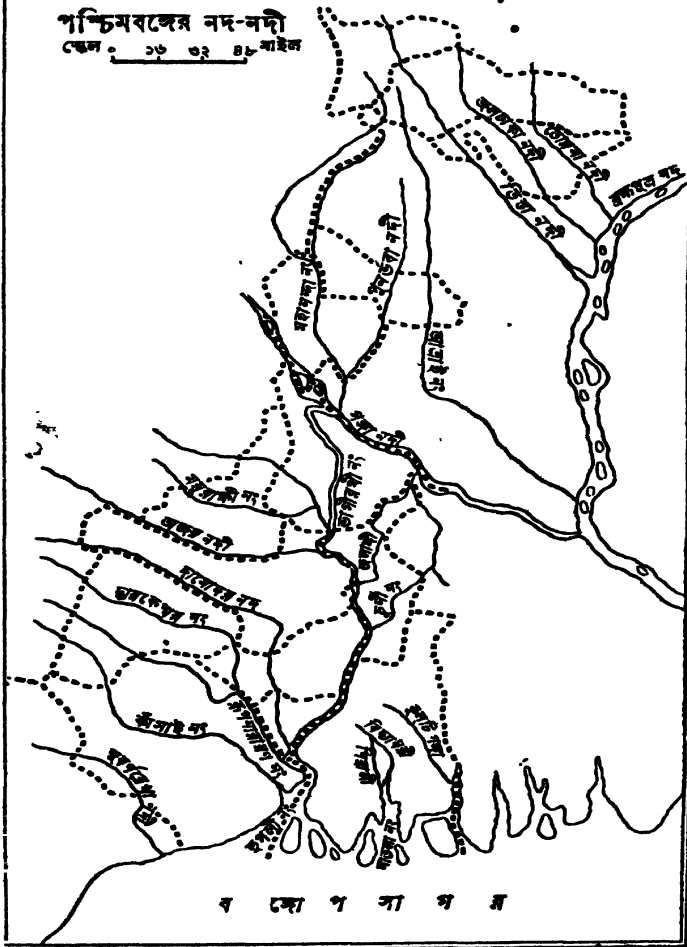
ধরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এ দিকে গঙ্গা মাল্দহ আর মুর্শিদাবাদের এক পাড় ভাঙছে, এক পাড় গড়ছে। দামোদর আর তিস্তার প্লাবন, তাদের নিষ্ঠুর ধ্বংসের কাহিনী, আজ প্রবাদবাক্যের মতো দাঁড়িয়ে গেছে।

হিমালয় অঞ্চল থেকে যে নদীগুলো বেরিয়েছে তাদের নাম করতে গেলে প্রথমেই নাম করতে হয় তিস্তার। তিস্তা নামটা এসেছে ত্রিস্রোতা শব্দটা ভেঙে। তিস্তার জন্ম সিকিমে। ২১,০০০ ফুট এক পাহাড়ের হিমপ্রবাহ থেকে এর যাত্রা শুরু। সিকিমে যখন বরফ গলার সময় আসে, যখন চাঙড়ের ধস নামে, তখন জল বাড়ে তিস্তার। যখন বর্ষা ঘনিয়ে আসে, অঝোরে জল ঝরতে থাকে, তখন পূর্ণসলিলা তিস্তা মদমত্তা।

ছু দিকে সোজা ঘন পাহাড়, পাহাড়ের তরঙ্গ। সবুজ গাঢ় বনভূমি। হাজার রকমের গাছপালা-লতাপাতায় সবুজ পাহাড়ী অঞ্চল। দিনে ঝিঁ-ঝিঁ ডাকে, বনে-বনে পাখির কলরব। এমনি নিস্তব্ধ পরিবেশে তিস্তা গর্জন করতে করতে ছুটে আসে ঝড়ের মতো। কখনো কখনো ঘণ্টায় ১৪ মাইল তার বেগ। তুই পাশের পাথরের তীরভূমি দেওয়ালের মতো। মাঝে মাঝে তারাও আটকে রাখতে পারে না তিস্তাকে। শ্রাবণের মেঘের মতো কালো জল,—ঘুলিয়ে উঠছে, ফেনিয়ে উঠছে। দার্জিলিঙের কাছে তিস্তা ১০০ গজ চওড়া, সমভূমিতে এসে সে ২০০ থেকে ৩০০ গজ। তিস্তার সঙ্গে মিলেছে রংগিত। রংগিতের জল গাঢ় সবুজ। তিস্তার কালো আর রংগিতের সবুজ জল যখন এক সঙ্গে মেশে, তখন কেউ কাউকে ঢেকে ফেলতে পারে না। কালো আর গাঢ় সবুজ স্রোত পাশাপাশি বয়ে চলে যায়।

সিঞ্চল পাহাড় থেকে আরো একটা নদী এসে তিস্তায় পড়েছে। তার নাম হল রাংনু। তিস্তা জলপাইগুড়িতে এসে বাঁক নিল। জলপাইগুড়ি শহরকে ডাইনে রেখে কোচবিহারের মধ্য দিয়ে তিস্তা পূর্ববঙ্গে পড়ল। আর তার শেষ হল ব্রহ্মপুত্রে।

চা-বাগান করার সময় জঙ্গল কাটতে হয়েছে। বনসম্পদকে নষ্ট করে চা-সম্পদ বাড়ানোর ফলে তিস্তায় বন্যার স্বাভাবিক প্রকোপ আরো বেড়ে গেছে। যে বন মাটি আঁকড়ে রাখত সে বনকে তার দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া হল না। বন্যা তাই নিয়মের শাসন মানল না। ১৯৫০ সালের তিস্তার ভয়াবহ বন্যার কথা তো আমাদের নিকট স্মৃতি।

হিমালয় অঞ্চল থেকে উৎপন্ন দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য নদীর নাম জলঢাকা। উত্তর দিক থেকে জলপাইগুড়িতে এসে জলঢাকা কিছুদূর গিয়ে দক্ষিণে মোড় নিয়ে কোচবিহারের ভিতর দিয়ে পাকিস্তানে গেছে। সংকোশ বা গদাধর জলপাইগুড়ি আর কোচবিহারের সীমানায়। দক্ষিণ দিক থেকে এসেছে তেরসা। খরস্রোতা বন্যনদী দ্রুত পায়ে পার হয়েছে জলপাইগুড়ি, ছুটেছে কোচবিহারের দিকে। কোচবিহার শহরকে বাঁয়ে রেখে চলে গেছে পূর্ববঙ্গে। ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিশেছে পার্বত্য নদীগুলো।

মহানন্দা গতি পালটিয়েছে। এক সময়ে এই মহানন্দা লক্ষ্মণাবতী-গৌড়ের ভিতর দিয়ে এসে করতোয়ায় মিশত। কিন্তু আজকে তার সে গতি আর নেই। এই পরিবর্তনের সঙ্গে আরো একটা নদীর নাম জড়িয়ে আছে, তার নাম হল কোশী। এই কোশী আর মহানন্দার গতি পরিবর্তনের ফলে গৌড়-লক্ষ্মণাবতী-পাণ্ডুয়া জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে।

পশ্চিম দিনাজপুর আর মালদহের ভিতর দিয়ে ধীর গতিতে বেরিয়ে গেছে মহানন্দা, পুনর্ভবা, আত্রাই আর কালিন্দী। হিমালয় অঞ্চল থেকে বেরিয়ে মহানন্দা বিহার পেরিয়ে এসেছে মালদহে আর পশ্চিম দিনাজপুরে। তারপর আরো একটু এগিয়ে মিশেছে গঙ্গার সঙ্গে। মালদহের ইংলিশ বাজারের কাছে কালিন্দী মিশেছে মহানন্দার সঙ্গে। এই স্রোত এগিয়ে গেছে আরো। ওদিকে পশ্চিম দিনাজপুরের ভিতর দিয়ে আসছিল পুনর্ভবা। কিন্তু রোহাইপুরের কাছে আসতেই মহানন্দা-কালিন্দীর মিলিত স্রোত সঙ্গে করে নিল পুনর্ভবাকে। কিন্তু পশ্চিম বাঙলায় বেশীক্ষণ থাকল না এই স্রোতোধারা। বর্ষায়-স্ফীতকায় আর অন্য-সময়-ধীর-মন্থর এই নদী চলে গেল রাজসাহীর ভিতর দিয়ে পূর্ব বাঙলায়। আর ওদিকে একলা আত্রাই পশ্চিম দিনাজপুরের ভিতর দিয়ে ব্রহ্মপুত্রের খোঁজে গিয়েছে পূর্ব বাঙলায়।

ছোটোনাগপুরের পাহাড়ী অঞ্চল থেকে যে সব নদী বেরিয়েছে তাদের ভিতর দামোদর প্রধান। বিহারের পালামৌ পাহাড় থেকে দামোদর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চলতে চলতে এল বাঁকুড়া আর বর্ধমানে; কিন্তু বর্ধমানেই গতি পরিবর্তন করে হাওড়া আর হুগলীর ভিতর দিয়ে এসে ভাগীরথীতে গিয়ে পড়ল। পালামৌ-এর পাহাড় থেকে ৩৩৬ মাইল পথ পেরিয়ে শেষকালে পেল ভাগীরথীর নাগাল। এই পর্যন্ত আসতে তাকে বইতে হয়েছে প্রায় চোদ্দটা নদীর জলভার। যে সব নদী বাঙলার সৌভাগ্যকে বিড়ম্বিত করেছে, বাঙলার নিশ্চিত আরামে অতর্কিতে হানা দিয়েছে, ধ্বংসের আর্তনাদে ভরিয়ে তুলেছে গৃহস্থের সংসার,

তাদের মধ্যে দামোদরের নাম নিশ্চয় সভয়ে স্মরণ করতে হয়। অবশ্য দামোদরের জন্মতেই এই খেয়ালীপনার উৎস। এ তার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সে প্রকৃতিকে বশ করা যেত কি না তা চিন্তা করার অবসর দিল না। উৎসমুখ থেকে আরম্ভ করে আশেপাশের বনজঙ্গল সাফ হতে শুরু হল। সভ্যতার পদক্ষেপ যতই নিশ্চিত হতে থাকল, ততই নির্মূল হতে আরম্ভ করল বন। বন্যার প্রকোপ হল স্বাভাবিক। দামোদরের বাঁধ বাঁধার ফলে কী অবস্থা হবে তা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবার বিষয়।

পাহাড়ী নদীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাঙলার মাটিতে নেমে এসেছে আর-একটা নদী,—তার নাম অজয়। বীরভূম আর বাঁকুড়ার সীমা নির্দেশ করছে সে। গরমকালে তার ঝিরঝিরে জলরেখা, রুপালী সাপের মতো এঁকে-বেঁকে এগিয়ে আসে। আবার এই অজয় নদীর প্রান্তশায়ী প্রান্তজলরেখা বর্ষায় আত্মগরিমায় স্বপ্রতিষ্ঠ। ফুলে ওঠে তার শরীর। মত্ত পালোয়ানের মতো ডাক ছেড়ে তেড়ে আসে তখন। তারপর বীরভূম থেকে বর্ধমানে কাটোয়ার কাছে ভাগী-রথীতে করে আত্মবিসর্জন। ময়ূরাক্ষীর উৎসমুখ সাঁওতাল পরগনায়। বীরভূমের মাঝখান দিয়ে পশ্চিম থেকে পুবে এর গতি। এর উপনদী হল বক্রেশ্বর। এই মিলিত জলস্রোত ভাগীরথীতে এসে মিশেছে।

বাঁকুড়ার মাঝখান থেকে বেরিয়ে গেছে দ্বারকেশ্বর। পশ্চিম থেকে পুবে এর গতি। তারপর হুগলীর উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে আরামবাগ ছুঁয়ে নদী দুই শাখায় ভাগ হয়েছে, মিশেছে শিলাবতীর সঙ্গে। সেখানে এর নাম রূপনারায়ণ,—মেদিনীপুরের সীমানা। তারপর গেঁওখালির উলটো দিকে হুগলী নদীতে মিশে গেছে রূপনারায়ণ। কোলাঘাটের আগে রূপনারায়ণ খুব বেশী চওড়া নয়।

এর দুই পাশে বাঁধ, পরিমিত এর বিস্তার। কিন্তু কোলাঘাটের কাছে এসে রূপনারায়ণ অকস্মাৎ প্রশস্ত হয়ে গেল। গড়ে দু মাইল এর বিস্তার। কিন্তু এত চওড়া হয়েও এ নদী তেমন উপকারে এল না। অনেকখানি চর থাকার জন্য আর খাদ খুব গভীর নয় বলেই জাহাজ চলাচলের অসুবিধা দূর হল না। ছোটোনাগপুরের পাহাড়ী অঞ্চলে জন্ম নিয়ে কংসাবতী বা কাঁসাই বাঁকুড়ার ভিতর দিয়ে এল মেদিনীপুরে। এখানে তার চরিত্র গেল বদলে। এখানে কুটিল হল তার গতি; স্রোতোরেখা বর্শার ফলক। এও দুই শাখায় বিভক্ত হল; মিশল হুগলীতে। সুবর্ণরেখাও ছোটোনাগপুরের পাহাড়ী অঞ্চল থেকে বেরিয়ে মেদিনীপুরের ভিতর দিয়ে উড়িষ্যায় গিয়ে মিশে গেছে বঙ্গোপসাগরে।

গঙ্গা হল পশ্চিম বাঙলার প্রাণ-স্বরূপিনী নদী। মানুষের ধর্মে কর্মে, আচারে অনুষ্ঠানে, সাহিত্যে কথায়, জীবনে মরণে গঙ্গা স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিতা। লোকজীবনের প্রতীক হল মকর-মুখী গঙ্গা। মহাদেব তাঁকে মাথায় করে রাখেন, ভগীরথের দুঃসহ সাধনায় মর্ত্যে আসেন গঙ্গা। গঙ্গার জল 'পুষ্পগন্ধবাহী', গঙ্গা 'স্বর্গনদী', 'দেবনদী'। তাই পুণ্যলোভী মানুষের ভিড় ঘাটে আঘাটে। শিল্পে সভ্যতায়, জ্ঞানে গরিমায়, কৃষি ও যন্ত্রশিল্পে সমৃদ্ধ গঙ্গার গতি-ইতিহাস একদিকে যেমন বিচিত্র অন্যদিকে তেমনি জটিল। পণ্ডিতেরা তর্ক করেন, কোনটা গঙ্গা নয়। কতদূর থেকে হল পদ্মা; ভাগীরথীরই বা অস্তিত্ব কোথায়। পুরোনো নকশার উপর ভিত্তি করে গতিপথের এক ইতিহাস অবশ্য রচনা করা হয়েছে। কিন্তু নিয়তচঞ্চলার লুপ্ত ইতিহাসে হয়তো এখনো সংশয় আছে।

রাজমহল পাহাড় থেকে সিক্রিগলি আর তেলিগড়ের পাহাড়ী খাদের মাঝখানে গঙ্গা এদেশে নেমেছে। মালদহ-মুর্শিদাবাদের ভিতর দিয়ে গঙ্গার সাগরমুখী যাত্রা। কিন্তু গঙ্গার মূল ধারা পশ্চিম বাঙলায় বেশী স্থায়ী হতে পারে নি। মাত্র ৪০ মাইল অববাহিকা আছে এ দেশে। মালদহ আর মুর্শিদাবাদ জেলার সীমানা দিয়ে গঙ্গা চলে গেছে পূর্ব বাঙলায়। তবু মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর থানার উত্তরাংশ থেকে গঙ্গার খণ্ডিত ধারা ভাগীরথী এসেছে এদেশে। অথচ একদিন এই ভাগীরথী দিয়ে হত গঙ্গার সমুদ্র-প্রয়াণ। কিন্তু ভাগীরথীর খাদ ভরাট হতে আরম্ভ করল পলিমাটিতে। প্রাকৃতিক কারণে গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তিত হতে থাকল পুব-দক্ষিণে। আজ ভাগীরথীতে গঙ্গার জল যায় খুব কম। কিন্তু কয়েক শ বছর আগেও ভাগীরথীর ভিতর দিয়ে যেত বড় বড় জাহাজ, সওদাগরের বাণিজ্য-তরী। বিপ্রদাসের 'চাঁদসদাগর' তরী ভাসিয়ে রাজঘাট রামেশ্বর পেরিয়ে পড়েছে সমুদ্রে। পথে পড়েছে অজয়। দেখা দিয়েছে উজানী, কাটোয়া, ইন্দ্রাণী। তরী ছুঁয়েছে সপ্তগ্রাম, পেরিয়েছে ত্রিবেণী। আরো দক্ষিণে বারুইপুর, চৌমুখী, শতমুখী। সবশেষে মিলেছে সাগরে। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাণিজ্যের অযোগ্য হল ভাগীরথী। এখন ছোটোনাগপুরের পাহাড়ী নদীর লাল জলে ভাগীরথীর পুষ্টি। ভাগীরথী নেমেছে দক্ষিণ দিকে। নাম পালটে গিয়েছে তার। নদীয়া আর বর্ধমানের সীমা নির্দেশ করে যেই নামল আরো দক্ষিণে, নাম হল হুগলী। এর পুব তীরে ২৪ পরগনা, পশ্চিম তীরে হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর। তারপর বঙ্গোপসাগরের নীল জলে গঙ্গার আত্মবিলোপ। কিন্তু লোকে

একে হুগলী বলে ডাকে না। লোকের কাছে এই-ই ভাগীরথী, পুণ্যতোয়া জাহ্নবী।

এই ভাগীরথী যাত্রাপথে পেয়েছে ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণের জলস্রোত; অন্য দিক থেকে এতে এসে মিশেছে জলাঙ্গী আর চুর্নীর শীর্ণধারা।

পদ্মা বা গঙ্গা থেকে উৎপন্ন হয়েছে ভৈরব, জলাঙ্গী, মাথাভাঙা। জলাঙ্গী কৃষ্ণনগরের কাছে এসে পশ্চিমমুখী হয়েছে। তারপর খুঁজে পেয়েছে ভাগীরথীকে। এই মিলনমুখ থেকে ভাগীরথীর নাম গেল বদলে, হল—হুগলী। একই উৎসমুখ থেকে চুর্নী মুর্শিদাবাদ আর নদীয়ার ভিতর দিয়ে ভাগীরথীতে মিলেছে। কিন্তু নদীয়া আর মুর্শিদাবাদের সব কটি নদীই প্রধানত ধারা-নদী: এদের কতকগুলোতে জল থাকে সারা বছর; কতকগুলো বর্ষার পর শুকিয়ে যায়। মনে হয়, ওরা আর নদী নয়; পায়ে-হাঁটা পথ। নদী মজে যাবার ফলে দেশের সর্বনাশ হয়েছে। বর্ষার জল বেরুতে পারে না। নামাল জমিতে জল জমে থাকে। তার ফলে মশার উপদ্রব; মহামারীর মতো ম্যালেরিয়া। গ্রাম আর জনপদ জনশূন্য।

নদীয়ার মাথাভাঙা নদীর শাখা ইচ্ছামতী রায়মঙ্গল নাম নিয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। হুগলী আর ইচ্ছামতী ২৪ পরগনার মধ্যে নাব্য। কিন্তু ২৪ পরগনার প্রায় সব নদীর জল নোনা। এই জল চাষবাসের বড় ক্ষতি করে। তাই বাঁধ দিয়ে জল আটকে রাখা হয়। মাছের চাষ চলে সেখানে। নদী ইচ্ছামত চলতে পায় না। পলিতে বোঝাই হতে থাকে নদীর খাদ। ফলে নদীপৃষ্ঠ কৃষিক্ষেত্র থেকে উঁচু হয়ে ওঠে। এই করে সৃষ্টি হয়—সৃষ্টি হয়েছে—মথুরা বিল, বিরাটি বিল, নাঙ্গল বিল, বালী বিল। ২৪ পরগনা এমনি বিল আর

বাঙলার নদী

নদী-খালের দেশ। একটার সঙ্গে অন্যটা যুক্ত। অনে
মতো এই নদীনালা। এদের মধ্যে আছে মাতলা, পিয়ালী, বি
কুলটী গঙ্গা। তাই দেখা যাবে ২৪ পরগনার মুখ যখন বঙ্গোপসাগ
মিশল তখন সে যেন সহস্রমুখী—অজস্র হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে
পড়েছে সাগরে।

মোগল বাদশারা যাকে বলতেন 'ভারতের স্বর্গ', ঔরঙ্গজেব যাকে বলতেন 'জাতির স্বর্গ', সেই বাঙলা নদীর দান। বিদেশী পর্যটকেরা এসে স্তম্ভিত হতেন বাঙলার গৌরবদীপ্তি দেখে। এই দীপ্তি দেখে আক্রমণকারীরা লুব্ধ হয়েছে বার বার। প্রতিহত হয়েছে তারা। এই বাঙলা বিদ্রোহীদের দিয়েছে আশ্রয়। হুমায়ুন, শের শা, সাজাহান, সুজা বিপদে শরণ নিয়েছেন এই দেশে। তার বহুধা-বিভক্ত নদীপর্বত শঙ্কিত করেছে প্রতিপক্ষকে। মোগল বাদশারা বহু যুদ্ধ করে, অনেক লোক ক্ষয় করে বাঙলাকে পদানত করতে চেয়েছে—সম্পূর্ণ ভাবে পারে নি কোনোদিন।

সক্রিগলিঘাট দুর্ভেদ্য দুর্গ। ঝাড়খণ্ড পেরিয়ে সমতল ভূমি দিয়ে বাঙলার ভিতর ঢোকা যাবে না। সেখানে প্রাণ হাতে নিয়ে চলা-ফেরা করতে হয়! বারো ভুঁইয়াদের বীরত্ব আজ প্রবাদ-কথা। আর ইংরেজ আমলে বর্ধমান আর বাঁকুড়ার রাজার যুদ্ধ, জাতির মুক্তির জন্য আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুদ্ধ।

কিন্তু এই নদী যেমন একদিকে দু হাত ভরে বিলিয়ে গেছে প্রাণ, যুগিয়েছে সমৃদ্ধির উপকরণ, অন্যদিক থেকে তাকে করেছে শ্মশান। তার দুর্নিবার গতি, মত্ততা আর খামখেয়ালীপনায় বহু নগর-বন্দর আজ অতীত কথা; স্মৃতির রাজ্য।

উত্তর বাঙলার করতোয়া একদিন ছিল প্রমত্ত নদী। প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্ধনের সীমারেখা করতোয়া উনিশ শতক অবধি অক্ষুন্ন গর্বে ছিল মহিমান্বিত। সেদিন তিস্তার জলধারা পড়ত এর গভীরে।

১৭৮৭ সালের বন্যায় গতি পালটাল, আরো পুবদিকে সরে গেল নদী। আর তার পর থেকেই করতোয়া আর আত্রাই তার গৌরব হারিয়ে ম্রিয়মাণ। এর কয়েক বছর পরে মাথাভাঙা আর চুর্নী পশ্চিম দিকে পড়ে হুগলীতে।

বুদ্ধের সময় কিংবা তারো আগে সমুদ্রগামী জাহাজ কাশীর মুখ অবধি যেত। এই গঙ্গার মুখের উপর ছিল মৌর্য সম্রাটের রাজধানী পাটলীপুত্র। তাম্রলিপ্তির গৌরবও সেদিন থেকেই। বন্দর হিসেবে তার সুখ্যাতি তখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ফা-হিয়েনের বিবরণীতে আছে তাম্রলিপ্তির উল্লেখ। কিন্তু দশম শতকের মাঝামাঝি নদীর খাদ ভরাট হতে শুরু হল। ষোড়শ শতাব্দী অবধি বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসেবে নিজেকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিল তাম্রলিপ্তি। যে ছিল একদিন নদীর ঠিক ধারে আজ সে কানেও শুনতে পায় না জলের গান। দূরে সরে গেছে নদী।

প্রাচীন কাহিনীতে পাওয়া যায় গঙ্গা তাম্রলিপ্তির পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছিল। নবদুর্গা-গোলাঘাট দিয়ে যেতে যেতে চাঁদ সদাগর যে হিজল বিল পাঠান বিল দেখেছিলেন সেগুলো নাকি আসলে ভাগীরথীর পরিত্যক্ত গতিপথ। হাজার বছর আগে এই অজয় আর ভাগীরথীর মোহনায় গড়ে উঠেছিল কনক গ্রাম। কেউ কেউ বলেন রাঢ় অঞ্চলের অসমতল ভূমির জন্যই নদী এত দ্রুত গতি বদলায়। দামোদর একদিন ভাগীরথীর সবচেয়ে বড়ো শাখানদী ছিল। মনসার ভাসানে একদা প্রসিদ্ধ অধুনালুপ্ত অনেক বন্দরের নাম পাওয়া যায়। দামোদরের একটা শাখা যেমন মিশেছিল ত্রিবেণীর কাছে ভাগীরথীতে, অন্য একটা শাখা এসেছিল সরস্বতীতে। আঠারো শতকের ম্যাপ থেকে বোঝা যায় পুরোনো রূপনারায়ণ ছিল

আরো বলিষ্ঠ। এই রূপনারায়ণের দুটো শাখা। একটা আজ যেমন হুগলীর সঙ্গে মিশেছে সেদিনও তেমন ছিল। অন্য আর-একটা শাখা তমলুকের কাছে মিশেছিল হলদী নদীতে। মহিষাদল থানা তাই একদিন ছিল একটা দ্বীপ।

সরস্বতী ও ভাগীরথীর মুখে সপ্তগ্রাম। একদিন ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রসিদ্ধ ছিল এই বন্দর, ছিল পূর্বভারতের গৌরব। প্রথম ও দ্বিতীয় শতেকেও এর নামডাক শোনা যেত। আবার পনেরো-ষোলো শতকেও এই সরস্বতী বেয়ে বড়ো বড়ো জাহাজ যেত। কিন্তু ১৭৬৪ সালের বিবরণ থেকে পাওয়া যায় যে সরস্বতী ইতিমধ্যে মজে গেছে, হয়ে গেছে সরু খাল,—মাত্র সাতফুট গভীর। সরস্বতীর গতিপথ নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহলে মতভেদ আছে। তবে একথা বলা যায় যে ষোলো শতকে গঙ্গার ধারা বইত সরস্বতী দিয়ে। বৃষ্টির সময় চন্দননগর চণ্ডীতলায় সরস্বতীর গতিপথ আন্দাজ করা যায়। গার্ডেনরীচের কাছে সাঁকরেলে এই স্রোত হারাল হুগলীর ভিতরে। একদিন দামোদরের একটা শাখা মিশেছিল সরস্বতীর ভিতর। তাকে বোধ হয় বলা হয় বাঁকা দামোদর। এর প্রবাহের মুখে পড়েছিল হাওড়া, মেদিনীপুর, ২৪ পরগনা। খিদিরপুরের কাছ থেকে একটা সরু খাল সাঁকরেলে সরস্বতীতে মিলেছে। প্রবাদ আছে, ওলন্দাজ বণিকরা তাদের সুবিধের জন্য ভাগীরথার স্রোত পরিবর্তন করতে ঐ খাল কেটেছিল। নবাব আলিবর্দি খান তখন বাঙলার মসনদে। এখন যেটা শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডন সেটাই ছিল ওলন্দাজ বণিকদের কারখানা আর বাঙলো। কালীঘাটের আদি গঙ্গা ছিল ভাগীরথীর অন্যতম শাখা। হাওড়ার বেতরের উল্টো দিক থেকে এর উৎপত্তি। তারপর দক্ষিণ-পশ্চিম গতিপথে

কালীঘাট, গোবিন্দপুর, গড়িয়া, বারুইপুর, জয়নগর, রাজপুরের পাশ দিয়ে নদী চলে গেছে। জয়নগর অবধি এই খালের নাম আদি গঙ্গা। কেউ বলে বড় গঙ্গা, কেউ বা গঙ্গা নালা। এ আজ একেবারে শুকিয়ে গেছে। কিন্তু মুকুন্দরামের মঙ্গলকাব্যে এই আদি গঙ্গার রূপ একেবারে ভিন্ন। আবার এ পরিচয়ও আছে যে আরাকানী জলদস্যুদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য বাঙলার বণিকরা সরস্বতীর ভিতর দিয়ে হিজলি হয়ে সাগরে না গিয়ে আদি গঙ্গার ভিতর দিয়েই যাতায়াত করত।

কিন্তু সবচেয়ে মর্মান্তিক পতন হয়েছে গৌড়ের। চৌদ্দ-পনেরো শতক থেকে সপ্তগ্রামের গৌরবে গ্রহণ লেগেছে। গৌড় তখন মুসলমান শাসকের রাজধানী, উঠেছে গৌরবের শিখরে। রাজমহলের কাছে গঙ্গা যেমন নামল বাঙলার মাটিতে, ঠিক তার পাশেই গৌড়। বাঙলার অন্যান্য প্রাচীন বন্দর উঁচু জমিতে। কিন্তু গৌড় ঠিক তার উলটো। বাঁধ দিয়ে গঙ্গার হাত থেকে বাঁচাতে হয়েছে গৌড়কে। ১৬০৮ থেকে বাঙলার মুসলমান রাজাদের রাজধানী হল ঢাকা। ইতিমধ্যে গঙ্গার গতি-পরিবর্তন আরম্ভ হয়ে গেছে। গঙ্গা বেঁকে গেছে আরো পশ্চিমে। পিছনে ফেলে রেখেছে শুধু জলাভূমি। তারপর ১৫৭৫ সালের মড়ক একেবারে শ্মশান করে দিয়েছে সমগ্র অঞ্চল। পরিবর্তিত গতিপথ ধরে গঙ্গা পদ্মা নাম নিয়ে পড়েছে ব্রহ্মপুত্রে। হুগলী নদীর শেষ ভাগ মোটামুটি অপরিবর্তিত আছে।

চৈতন্যচরিতামৃত বা কৃত্তিবাসী রামায়ণে হুগলীর সাগরসঙ্গমকে বলা হয়েছে 'শতমুখী গঙ্গা।' আর এর কূলে বসেছে কুবেরের আসর। পর্তুগীজরা বেতর দেখে মুগ্ধ হয়। এটাই বোধ হয়

বাঙলাদেশে প্রথম বিদেশী ঘাঁটি। ১৭১৪ সালে ইংরেজরা নবাবের কাছে যে সব জায়গায় কুঠি করতে চায় তার ভিতর ছিল সালকিয়া, হাওড়া, বেতর। আর তারপর থেকে সপ্তগ্রাম-তাম্রলিপ্তি-গৌড়ের পতনের পর পত্তন হল কলকাতার। ইংরেজ শক্তি সুদৃঢ় হল, কলকাতার চেহারা ফিরল। দিন গেল, হুগলী নদীর দুই পারে বসল কলকারখানা। আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে সজ্জিত হল কল-ঘর। চোঙা থেকে ধোঁয়া উঠল, চাকা ঘুরল; কালের গতি বদলাল। কলকাতার বন্দর নিল চেহারা: প্রাচীন তাম্রলিপ্তির সমুদ্র-গৌরব নিয়ে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প-ও-বাণিজ্য-কেন্দ্র বলে আত্মপ্রতিষ্ঠা করল। আর নিরন্তর বইতে লাগল ভাগীরথী-হুগলী।

অরণ্য-সম্পদ

নদীনালার মতো গাছপালা ঘিরে আছে বাঙলার অনেকখানি জীবন। লোকাচার ধর্মাচার যাই ভাবা যাক, গাছ না হলে চলে না। পুজো হবে ;—আনো বিল্বপত্র, তুলসী। মেয়েরা ব্রত করবে,—চাই অশ্বত্থ পাতা ; আনতে হবে কলা, হলুদ, পান-সুপারি, নারিকেল। চাই আমের মঞ্জরী, ধানের গুচ্ছ, ধান-দূর্বার আশীর্বাদ। গণেশঠাকুরের বিয়ে হল আবার কলাবৌএর সঙ্গে। বৃষ্টির কামনা করে 'বসুধারা' ব্রত, শস্যের প্রাচুর্য কামনা করে শসপাতার ব্রত। লৌকিক ব্রতকথায় সুখী জীবনের স্বপ্নের ছায়া ফেলেছে গাছ। মেয়েরা সুর করে তাই বলে :

> পাকা পাতাটি মাথায় দিয়ে পাকা চুলে সিঁদুর পরে
> কাঁচা পাতাটি মাথায় দিয়ে কাঁচা সোনার বর্ণ হয়
> শুকনো পাতাটি মাথায় দিয়ে সুখ-সম্পত্তি বৃদ্ধি করে।
> ঝরা পাতাটি মাথায় দিয়ে মণিমুক্তোর ঝুরি পরে
> কচি পাতাটি মাথায় দিয়ে কোলে কমল পুত্র ধরে……

গাছের মায়া বাঙলার মানুষের অনেক দিনের মায়া। হয়তো বাঙলার জন্মের অধিকারে পাওয়া এই মায়া। সে একদিন ছিল যখন শহর গড়ে ওঠে নি। কলকাতার রাজপথ তৈরী হয় নি। সেদিন সুতানটী-গোবিন্দপুরের রূপান্তর ছিল অচিন্তনীয়। কালীঘাটের ধারে ছিল ডাকাতের আড্ডা। সেদিন সমস্ত বাঙলাকে ঘিরে ছিল এই বন। উনিশ শতকের শেষের দিকেও দার্জিলিঙে তরাই আর

তরাই

ডুয়ার্সে, সদর কোচবিহার আর দিনহাটায় ছিল গভীর অরণ্য। দিনাজপুরের রায়গঞ্জে, মালদহের ভালুকা, রাতুয়া ও মানিকচকে, বীরভূমের নলহাটী, রাজনগর, মহম্মদবাজার ও দুবরাজপুরে, আসানসোলে আর বাঁকুড়ায় ছিল গভীর বন। কাঁসাই নদীর পশ্চিম দিকে আর সুন্দরবনে ছিল গহন বন আর বড় বড় জলা। বাঙলার সব নদীর দুই-পার ঘিরে ছিল নিবিড় অরণ্য-অঞ্চল। প্রাচীন লোককথার মধ্যে এইসব অঞ্চল বেঁচে আছে আজো। জলপাইগুড়ির তিস্তা আর তেরসার মধ্যে ; মালদহের মহানন্দা ও কালিন্দী, টাঙন আর পুনর্ভবার মধ্যে ; মুর্শিদাবাদে কালান্তরে আর হিজল বিলে, হাওড়ার দামোদর আর সরস্বতীর মধ্যে, হুগলীতে দামোদর আর হুগলী নদীর মধ্যে এই অরণ্যের স্বাক্ষর।

কিন্তু এ হল অতীত কথা। শহুরে সভ্যতার দাপটে অরণ্য নির্মূল হতে আরম্ভ করেছে। চায়ের ব্যাবসা যখন লাভজনক শিল্পের খাতায় উঠল, তখন দার্জিলিঙের পার্বত্য অঞ্চলে, তরাই আর

সুন্দরবন

ডুয়ার্সে বনস্পতি তার সাম্রাজ্য হারাতে আরম্ভ করল। চাষের জমির জন্য নির্মূল হল দিনাজপুর আর মালদহের অরণ্য-অঞ্চল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দাপটে গেল বীরভূম, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ আর বাঁকুড়ার বন। গত একশ বছরের ভিতর গেল সুন্দরবনের একহাজার বর্গমাইল-জোড়া বনভূমি। সেখানে হল চাষআবাদের ব্যবস্থা। তারপর দুর্ভিক্ষের হাত থেকে ত্রাণ পাবার আশায় মানুষ জমির ক্ষুধায় আরো যোজন-যোজন বনভূমিকে শস্যভূমিতে পরিণত করল।

কিন্তু শস্যভূমিরও তো দরকার। তাই অরণ্যকে একদিন না একদিন ছেঁটে ফেলতেই হবে। কথাটা ঠিক। কিন্তু এ কথার

ভিতরও একটা 'কিন্তু' আছে। বনভূমির প্রয়োজন তো শুধু বনভূমির জন্য নয় ; এর প্রয়োজন শস্যেরই কারণে, সৃষ্টিরই কারণে। অরণ্য-অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশী হয়। এ কথা বৈজ্ঞানিক সত্য। দেশের বৃষ্টিপাতের সঙ্গে অরণ্যের সম্বন্ধ নিবিড়। পাথুরে মাটিতে গাছ শিকড় চালিয়ে দেয় পাথরে। গুঁড়ো হয়ে যায় পাথর। শেষে মাটি হয়ে যায় একদিন। ঝরাপাতা, লতাপাতা পচে পচে তৈরী হয় নতুন মাটি। ঘাস, শিকড় মাটির ক্ষয় রোধ করে আবার। বৃষ্টিতে ধোয়া মাটি আটকে থাকে—গলে ভেসে চলে যায় না। তাই বনের সঙ্গে শস্যসৃষ্টির যোগ খুব ঘনিষ্ঠ। বিশেষজ্ঞরা বলেন, দেশের আয়তনের একচতুর্থাংশ বনভূমি থাকা কাম্য।

কিন্তু যখন বন উচ্ছেদ করা হয়েছে, কোনো দিকে কেউ তাকায় নি। গাছের পর গাছ কেটে জমি সাফ করে লাঙল দিয়েছে কেউ, কেউ বা তুলেছে নতুন বসতি। দিগ্‌বিদিগ্‌-জ্ঞানশূন্য হয়ে জমি পরিষ্কারের নির্মম ফল পাওয়া গিয়েছে হাতে হাতে। কড়ায় গণ্ডায় প্রতিশোধ তুলেছে বনস্পতি। রাঢ় অঞ্চলের দিকে মাটি খুব অগভীর, যদিও ভূমিপৃষ্ঠ অপেক্ষাকৃত উঁচু। এর তলায় পাথর। হাজার হাজার গাছের লাখ লাখ শিকড় অবিরাম যুদ্ধ করত সেই পাথরের সঙ্গে। গুঁড়ো হয়ে যেত পাথর ; মাটি হত কালক্রমে। আর ঝরা পাতা, লতাগুল্ম, ঘাস, গাছের গুঁড়ি, এরাও গলে পচে মাটি হত। নতুন মাটি সৃষ্টি হত এইভাবে। কিন্তু বন-উচ্ছেদের ফলে নতুন মাটি সৃষ্টির সম্ভাবনা শুধু নষ্ট হল না, তার সঙ্গে এল গভীর সর্বনাশের ইঙ্গিত। যতটুকু মাটি আছে বর্ষার জল তার উপর দিয়ে বইতে আরম্ভ করল ; মাটি কেটে চলে গেল জলের সঙ্গে। আর কালক্রমে অনাবৃত হল মাটি, দেখা দিল ভিতরের পাথর। সে

জমিতে আর চাষআবাদ হল না। ১৯১৭ সালের পর চন্দ্রকোণা, শালবনী ও কেশপুর থানার ১৩০ বর্গমাইল জমি হল চাষের অযোগ্য। বাঁকুড়ার চাষ হ্রাস পেয়েছে অনেকখানি। বর্ধমানের দুর্গাপুর ও গোপভূমি এর জন্যই দুর্গত। ওদিকে দামোদরের উৎসমুখ অরণ্য-মুক্ত হল, আর দামোদরের বন্যা বেড়ে গেল। ডুয়ার্স আর তরাই-এ চা-চাষ যত বাড়তে থাকলো তিস্তা ততই হতে থাকল প্রমত্তা।

১৯৫১ সালের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে পশ্চিম বাঙলার বনাঞ্চলের পরিমাণ ৫,১৭৩ বর্গমাইল, অর্থাৎ পশ্চিম বাঙলার আয়তনের $\frac{1}{6}$ ভাগ। এর মধ্যে সরকারী রিজার্ভ বনের পরিমাণ ৩,৮৯৪ বর্গমাইল। বাকিটা বেসরকারী বন। কিন্তু বেসরকারী বন ১৯৪৫ সালের প্রাইভেট ফরেস্ট অ্যাক্ট অনুসারে নিয়ন্ত্রিত।

বাঙলায় বনের রূপের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। কোচবিহারের উত্তর, কালিম্পঙ ও ভুটানের দক্ষিণ, তিস্তা ও সংকোশের মধ্যবর্তী বন ডুয়ার্সে পাওয়া যাবে পাইন, ফার। এগুলো দার্জিলিঙ ও সিকিমের সরলবর্গীয় বন। এর নীচে তরাই অঞ্চল। এখানে আবলুস, রবার, বাঁশ, ফার্ন। এর নাম চিরহরিৎ অঞ্চল। এখানে বন গভীর, নিবিড়। এখানে বাঘ, চিতাবাঘ, গণ্ডার, হাতি দেখতে পাওয়া যাবে। পাঁচ রকমের হরিণ বনভূমির রূপকে বাড়িয়ে তুলেছে। বুনো মহিষ আর বুনো কুকুরের দেখা পাওয়া যাবে সর্বত্র। বহুবিচিত্র এখানকার পশুপাখি। তিস্তার অঞ্চল এদের সবচেয়ে প্রিয় আস্তানা।

সমভূমিকে ছায়া দেয়, শাল, সেগুন, বট, অশ্বত্থ, দেবদারু, তেঁতুল, বেল, জাম, আম ইত্যাদি মৌসুমী অঞ্চলের গাছ। রাঢ় অঞ্চলের অরণ্যভূমি ছোটনাগপুরেরই আর-এক সংস্করণ। মেদিনীপুরে আর বাঁকুড়ায় মহুয়া দেখতে পাওয়া যায়। কঠিন মাটিতে কেঁদ শালের

বন দূর পাহাড়ের দিকে চলে গেছে। এসব অঞ্চলে নতুন করে বন সৃষ্টি করা আরম্ভ হয়েছে। এখানে যে সব শাল দেখতে পাওয়া যায়, তারা জাতে খুব ভাল নয়। সমগোত্রীয় ছোটোনাগপুর বা ময়ূরভঞ্জের দীর্ঘ সরল শাল গাছের কাছে এরা যেন বড়ো অসহায়; বড়ো কাঁচা, বড়ো বেঁটে। কিন্তু এই অরণ্য থেকে অন্য উপকার পায় এদেশের মানুষ। মুর্শিদাবাদের শাল গাছে তসর গুটিপোকার মৌমাছির বাসা। শতমূল আর অনন্তমূল পাওয়া যাবে এই বনে। পুনর্ভবা নদীর পাড়ে তৃণভূমি। নাগরমুথা ঘাস থেকে হয় মাতুর, খসখস। সাঁওতাল আদিবাসীরা বন থেকে বনে ঘুরে কুড়িয়ে কুড়িয়ে বেড়ায় এইসব ওষধি। মালদহে বড়ই গাছ থেকে পাওয়া
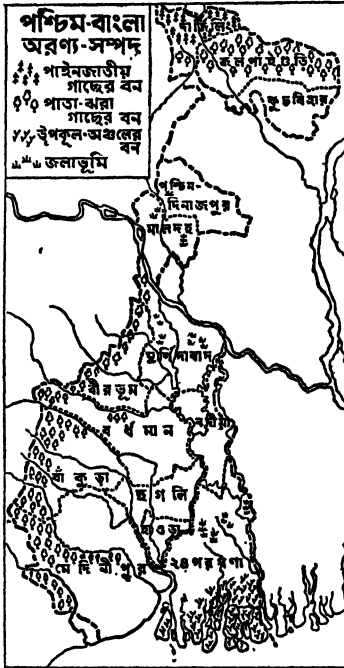
যাবে গালা। নদীয়ায় বাবলা গাছের আঠা কুড়োনো ছিল একদিন লাভজনক ব্যবসা। সমতল অঞ্চলের বনভূমিতে নানা জাতের জানোয়ার দেখতে পাওয়া যায় না। মেদিনীপুর আর বাঁকুড়ায় হয়তো ক্বচিৎ কখনো দু-একটা হায়না বা নেকড়ে বাঘ চোখে পড়ে। মেদিনীপুরের বনভূমির কিছুটা অংশ যে হাতির আদরে লাঞ্ছিত হয় সেই হাতি মেদিনীপুরের বাসিন্দা নয়।

তারা আসে ছোটোনাগপুর কিংবা ময়ুরভঞ্জের জঙ্গল থেকে। কিন্তু বৈচিত্র্যময় হল সুন্দরবনের বন। এ হল জোয়ার-অরণ্য। জোয়ারের সময় জলে থৈ-থৈ করছে বন ; ভাটার সময় জল সরে যায়। আর কাদার ভিতর পা দিয়ে আকাশের দিকে মাথা তুলে দেয় গরান, শিশু, সুন্দরী, হিন্তাল। পাড়ের দিকে কেওড়া ঝোপ বেঁধে থাকে। এই হল একদা-খ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের বাসভূমি। মঙ্গল-কাব্যের রায়মঙ্গল আর পীরের উপকথায় জীবন্ত এই অরণ্য অঞ্চল। কাঠুরে যারা, ফকির, বাওলী, যাবে বনের ভিতর ; সংগ্রহ করবে গোলপাতা, মাতুর তৈরী করার ঘাসের জন্য। যোগাড় করবে মধু। বড় বড় নৌকো করে ভাসবে জলে ; ভিড়বে ঘাটে আঘাটে ; গঞ্জে। সেই গোলপাতার ছাউনি হবে মাটির ঘরে। বর্ষার আগেভাগে শেষ করতে হবে ছাউনি তোলার কাজ। ভরা বর্ষায় সুন্দরবন হবে নীরব নিথর। শুধু মাঝরাতে শোনা যাবে বাঘ আর চিতল হরিণের ডাক, আর জলে কুমিরের ঘাই।

কৃষি-সম্পদ

নদীমাতৃক বাঙলা কৃষিপ্রধান দেশ। এ কথাটা আজ যেন প্রবাদ হয়ে গেছে। জ্ঞান হবার পর থেকেই তো দেখছি দিগন্তজোড়া সবুজ ধানের খেত। দেখেছি কাঁচা সোনার রঙ নিয়ে পাকা ধানের মাঠ। দেখেছি মানুষ-সমান পাটের খেত। সেখানে লুকিয়ে থেকেছে হয়তো বুনোশুয়ার। গল্পে শুনেছি, কোনো নামকরা কয়েদ পালিয়ে থাকত সেখানে। ছবির মতো চোখে ভাসে কাটা পাটের মাঠ, ডোবা-বিলের জলে পচানো পাটের রাশ, এককোমর জলের ভিতরে দাঁড়িয়ে মুগুর মেরে আঁশ ছাড়ানো, ভারায় মেলতে দেওয়া, গোরুর গাড়ি বোঝাই করে গঞ্জের হাটে চালান দেওয়া। ওদিকে আখের খেতের পাতা ধারালো তলোয়ারের মতো। আট-মুখ উনুনে রস জাল দেওয়া। মটরশুঁটির ফুল, সর্ষের খেত। দেখে দেখে চোখ ভরেছে, মন মজেছে। ভালো লেগেছে, ভালোবেসেছি।

তাই যখন শুনি কৃষিপ্রধান দেশ এই বাঙলা, নতুন কিছু শুনলাম বলে মনে হয় না।

কিন্তু কখনো কখনো এই পুরনো কথাটাই কানে চমক লাগায়, কথাটাকে নতুন করে উপলব্ধি করতে হয়। কোনোবার হয়তো ধান হল না; পাটের দর গেল পড়ে, গুড়ের দাম নেই, অথচ জিনিস আক্রা। ভেবেছি কেন এমন হল? বৃষ্টি হল না কোনোবার। দিন গোনা সার। কালবোশেখী পেরিয়ে গেল। আষাঢ় যায়-যায়। আকাশ হাসছে। দেখেছি কী দারুণ দুশ্চিন্তায় দিন কাটায় মানুষ। আকাশের দিকে তাকিয়ে চোখ ফেটে পড়ে,—মেঘ নেই কোথাও। জলায় কান

পাতে, ব্যাঙ ডাকে না। সব আশায় জলাঞ্জলি দেয় মানুষ। তখন বুঝতে বাকি থাকে না কৃষিপ্রধান দেশ বলতে কী বোঝায়!

বাঙলার উন্নতির কথা যখন ওঠে, পণ্ডিত মহলে তাই তখন তর্কের বান ডাকে। কূট যুক্তির জাল, তথ্য ও তত্ত্বের রাশ জড়ো হয়। কেউ বলেন, জমিদারি প্রথা না গেলে কৃষির উন্নতি নেই। কৃষকের হাতে জমি না এলে চাষের হাল ফিরবে না। কেউ বলেন, জল সেচের ব্যবস্থা চাই; বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিব্যবস্থা হওয়া দরকার; ইত্যাদি। এ সব অর্থনীতির ব্যাপার। তবে এটুকু বুঝতে বুঝতে দেরি হয় না যে কৃষিপ্রধান দেশ বলেই কৃষিসমস্যাটা জাতীয় সমস্যা।

চাষের কথা উঠলে প্রথমেই ধানের কথা ওঠে। ধান বাঙলার প্রথম ও প্রধান কৃষিসম্বল। তাই মানুষের মমতায় অভিষিক্ত হয়ে ধান পূজা-পার্বণ থেকে কাব্যে কথায় এক আদরের স্থান নিয়েছে। মহাকবি কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ, সবাই ধানকে ভালোবেসেছেন, কাব্যে স্থান দিয়েছেন। রঘুবংশে কবি বলছেন, ধানের চারাগাছ যেমন একবার উৎপাটন করে আবার রোপণ করা হয়, রঘুও তেমনি বাঙলায় মানুষকে উৎপাটন করে আবার রোপণ করেছেন। আর রবীন্দ্রনাথ? অবাক হতে হয় কতবার কি বিভিন্ন ভাবে ধান আর ধানের মঞ্জীর ছায়া ফেলেছে তাঁর মনে। বাঙলার মানুষ আদর করে ধানের নানান নাম দিয়েছে। কোনোটাকে বলেছে কামিনী; বলেছে শালি, কনক, চম্পা, দীঘা। এমনি হাজার মিষ্টি মধুর নাম দিয়ে তার প্রীতি-প্রেমের অক্ষয় কাব্য রচনা করেছে।

ধান সব জমিতে হয় না; জমির ভেদ আছে। ধান হতে গেলে যেমন চাই প্রচুর জল তেমনি তাপ। এই জল আর তাপের প্রভাবে ধানের জন্ম, বৃদ্ধি। ধান যখন বাড়ন্ত তখন তাপমাত্রা ৬০°

থেকে ৮০° থাকা দরকার। যখন জন্মাচ্ছে তখন মাঠে জল থৈ-থৈ করবে। তাই ধানখেতের মাটির বাইরের স্তর উর্বর পলিমাটি দিয়ে গঠিত হবে কিন্তু ভিতরের স্তর থাকবে কঠিন ও অপ্রবেশ্য। আর যখন ধান পাকো-পাকো তখন উষ্ণ ও শুষ্ক জলবায়ু খুব প্রয়োজন। বাঙলাদেশে সাধারণত তিন জাতের ধান হয়। শীতের শেষে নাবাল জমিতে বোরো চাষ হয়। এর ফলন ফলতে প্রায় ৬০ দিন লাগে বলে এর আর-এক নাম ষেটো ধান। পাকা ধানের উপর বৃষ্টির জল খুব খারাপ। বসন্তের শেষের দিকে রোয়া হয় আউশ বা আশু। যদিও একে আউশ বা আশু বলা হয়, কিন্তু বোরো ধানের আগে এর ফলন হয় না। আর আমন ধান রোয়া হয় বর্ষার সময়। এ ধান ঘরে ওঠে শীতের সময়। আউশ ওঠে বর্ষায়।

বর্ধমান জেলায় বেশীর ভাগ হয় আমন; বোরো অথবা আউশের পরিমাণ খুব অল্প। বীরভূমেরও সেই অবস্থা। এখানে মোট চষা

জমির প্রায় অর্ধেক জমিতে হয় আমন ধানের চাষ। বাঁকুড়ায় আমন ধানের পরিমাণ বেশী, যদিও সেখানে আউশ্ কিংবা বোরোর চাষও হয়। মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ 'পরগনায় বেশীর ভাগ আমন ধানের চাষ। কেবল নদীয়ায় আউশের চাষের পরিমাণ বেশী। মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার ও দার্জিলিঙে আমন ধান হয় বেশী। মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরে তিন শ্রেণীর ধান দেখতে পাওয়া যায়।

কিন্তু কৃষিপ্রধান দেশ হলেও খাদ্যশস্যে স্বাবলম্বী হতে পারে নি পশ্চিম বাঙলা। বাঙলার 'শস্যভাণ্ডার' বলতে যা বোঝাত একদিন, তা তো আজ পূর্ব বাঙলায়।

এখন পশ্চিম বাঙলায় আবাদী জমির পরিমাণ ১,১২,৮০,৮০০ একর। চলতি পতিত জমি হবে ৯,৩২,৫০০ একর। এই আবাদী জমিতে ১২,৭২,৬০০ একর জমিতে রোয়া হয় আউশ ধান; ৮১,৩৫,২০০ একর জমিতে আমন আর ৩৭,৫০০ একর জমিতে রোয়া হয় বোরো ধান। চলতি হিসেব অনুসারে বলতে গেলে একর-পিছু ধানের ফলন হল ১২ মন ২ সের। হিসেব করে দেখা গেছে, এদেশের মাথাপিছু প্রত্যেক মানুষের এক বছরে খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হল ৪ মন ১০ সের। উৎপাদনের পরিমাণ :—

(হাজার টনের হিসাবে)

	১৯৪৯	১৯৫০	১৯৫১	১৯৫২
আমন	২,৮৮২'৮	৩,২৬৯'৫	৩,৫৫৯'০	৩,১০৩'৩
আউশ	৩৭৬'০	৩৩৫'৯	৩৫৯'৭	৩৫৯'৭
বোরো	১৬'৩	১৬'১	১৫'৫	১৫'৫
মোট	৩,২৭৫'১	৩,৬২১'৫	৩,৯৩৪'২	৩,৪৭৮'৫
বীজ ও ঘাটতি	১০			
শতাংশ বাদে	৩,০১৫	৩,৩২৬	৩,৬৩৫	৩,২২৫
লোকসংখ্যা (লক্ষে)	২৩২	২৪৬	২৪৮	২৫২
উৎপন্ন শস্য সমান ভাগে মাথা-পিছু ভাগ করলে প্রতি লোক যা পেত (মন)	৩'৫৪	৩'৬৮	৩'৯৯	৩'৫১

সুতরাং দেখা যাচ্ছে পশ্চিম বাঙলায় মাথাপিছু প্রয়োজনে বেশ খানিকটা ঘাটতি থেকে যাচ্ছে।

ধানের পর নাম করতে হয় পাটের। পাটই একমাত্র অর্থকরী শস্য। পাট চাষের জন্য চাই ৮০° চেয়েও বেশী উত্তাপ আর ৮০" চেয়েও বারিপাত। দো-আঁশ অথবা পলি মাটিতে পাট ভালো হয়। যে সব জমিতে জল দাঁড়ায় সে সব জমি পাট চাষের পক্ষে বড়ো ভালো। কিন্তু উঁচু জমিতেও পাট হয়। বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা পাট চাষের পক্ষে উপকারী, কিন্তু পাটের জন্য যা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তা হল সস্তা ও দক্ষ মজুর। তাই যে সব অঞ্চলে বসতি ঘন, বৃষ্টিপাত ও উষ্ণতা প্রচুর সে সব জায়গায় পাট হয় ভালো। অবিভক্ত বাঙলা একদিন পাটের জন্য ছিল সবচেয়ে প্রসিদ্ধ।

ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান একত্রে আজো পৃথিবীর উৎপন্ন পাটের মোট ৯৫ ভাগ উৎপাদন করে।

বিদেশে পাট রপ্তানির জন্য তাই সব সময় চাহিদা। বাঙলাদেশে চটকলগুলো প্রায় হুগলীর ধারে। অথচ পাট বেশীর ভাগ উৎপন্ন হয় পূর্ব বাঙলায়। তাই বাঙলা ভাগ হয়ে যাবার পর পাট-শিল্প ও পাট-চাষে সমস্যা দেখা দিল। এই সমস্যা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য পশ্চিম বাঙলার পক্ষে পাট চাষের উৎসাহ দেওয়া হয়। পাট চাষের সবচেয়ে বড়ো প্রলোভন হল, যদি ফসল একবার ভালো হয় তো চাষীর হাতে আসবে কাঁচা পয়সা। তাই যে বর্ধমান জেলায় আগে পাট হত মাত্র কালনা আর জামালপুর থানায়, এখন সেখানে পাটের চাষ আস্তে আস্তে প্রায় সমস্ত জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। বাঙলার প্রতি জেলায় আজ পাট চাষের পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা দেখা যায়। মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ পরগনা আর নদীয়ায় পাট চাষের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। জলপাইগুড়িতে চায়ের সঙ্গে পাটের প্রচ্ছন্ন পাল্লা চলেছে। কোচবিহারে ধান চাষের পরিমাণ কমে পাট চাষের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মুর্শিদাবাদে ধানের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে পাট।

কাঁচা পয়সার লোভে পাটের প্রতি চাষীর দরদ যে বাড়বে তা সহজে বোঝা যায়। কিন্তু এই অতি দরদের পরিণাম খুব শুভ বলে মনে হয় না। কারণ, বিশ্বের বাজারে ইতিমধ্যে পাটের প্রতিযোগী এসেছে। পাটের কাজ হচ্ছে রুশীয় শণে, যুক্তরাষ্ট্রের কাগজের থলে ব্যবহার করার রেওয়াজও চালু হয়েছে। জার্মানিতে এক রকম মণ্ড তৈরী হচ্ছে যা প্যাক করার কাজে খুব উপযোগী বলে অনেকের ধারণা। সুতরাং পৃথিবীর বাজারে পাটের এই আদর খুব দীর্ঘস্থায়ী

হবে বলে মনে হয় না। তার উপর ধানের চাষ কমিয়ে দিয়ে পাটের চাষ বাড়ানোর ভিতর কোনো দূরদর্শিতা আছে বলে অনেকে স্বীকার করেন না। আবার ব্রহ্মদেশে এবং দক্ষিণ আমেরিকায় পাটের চাষ আরম্ভ হয়েছে। এতকাল অবধি পাট চাষের একচ্ছত্র অধিপতি ছিল ভারতবর্ষ। তার কারণ এই নয় যে একমাত্র ভারতবর্ষের জমি, উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত পাট চাষের পক্ষে একান্ত উদার। ক্রান্তীয় অঞ্চলের প্রতি দেশে পাট চাষের বিপুল সম্ভাবনা। তবু ভারতবর্ষে পাট চাষের এত উন্নতির কারণ ভারতবর্ষের সুলভ মজুর। পচা জলে সারাদিন দাঁড়িয়ে পাটের ফেঁসো ছাড়ানোর মতো গ্লানিকর কাজ অতি দরিদ্র ভারতবর্ষের মজুর ছাড়া আর কে করবে! তাই সভ্যতা যতই এগিয়ে যাবে, বিজ্ঞান পাটের ফেঁসো ছাড়ানোর কোনো বৈজ্ঞানিক ও রুচিসম্মত পন্থা আবিষ্কার করবেই। সেদিন ভারতের পাট-শিল্পের উপর নামবে অভিশপ্ত দুর্দিন।

এখন পশ্চিম বাঙলায় মোট ৩·৭ লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ হয়। একর-পিছু উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ৩·৪ মন। এখানকার চটকল আর সাধারণ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পাটের পরিমাণ ৬৪·২ লক্ষ গাঁইট। সমস্ত ভারতবর্ষে উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ৩১·২ লক্ষ গাইট। প্রতি গাঁইটে ৫ মন কাঁচা পাট থাকে।

গম, যব, ভুট্টা চাষের জন্য তাপের দরকার হয় বেশী, জলের দরকার কম। এ জাতীয় শস্য উৎপাদনের জন্য কমপক্ষে ৬৬° তাপ থাকা দরকার। চাষের প্রথম অবস্থায় বৃষ্টিপাত হলে ভালো হয়। কিন্তু জল দাঁড়ালে চাষের খুব ক্ষতি হয়। উর্বর দো-আঁশ জমিতে বেশী ফলন পাওয়া যায়। বাঙলার জলবায়ু এ জাতীয় শস্যের খুব উপযুক্ত নয়। তবু মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি, নদীয়া এবং

পশ্চিম-বাংলা
প্রধান প্রধান শস্য
ধান
পাট
আখ
তামাক
চা
দার্জিলিং
জলপাইগুড়ি
কুচবিহার
দিনাজপুর
মালদহ
মুর্শিদাবাদ
বীরভূম
বর্ধমান
নদীয়া
বাঁকুড়া
হুগলি
হাওড়া
মেদিনীপুর
২৪ পরগণা
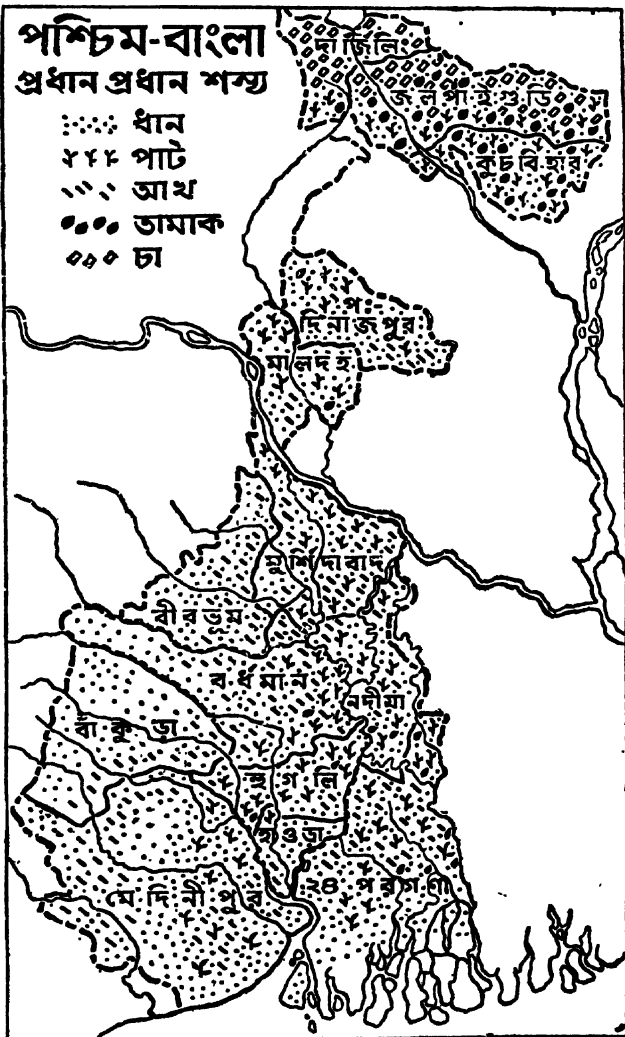
হাওড়ায় গমের চাষ হয় অল্প-বিস্তর। এখানে ১০০ হাজার একর জমিতে গম উৎপাদন করা হয়। একর-প্রতি ফলনের গড় ৮·৪ মন। মেদিনীপুর, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ আর জলপাইগুড়িতে যব আর বীরভূম, বাঁকুড়া আর জলপাইগুড়িতে ভুট্টার চাষ দেখতে পাওয়া যায়।

পশ্চিম বাঙলার আরেকটি অর্থকরী শস্য হল চা। কিন্তু চাকে শস্যের ভিতর না ধরে শিল্প হিসাবে ধরা ভালো। চায়ের জন্য প্রায় ৬০" থেকে ১০০" ইঞ্চি বৃষ্টি হওয়া দরকার। চা-বাগিচায় জল দাঁড়ালেই চারা নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য পাহাড়ী ঢালু অঞ্চল চা উৎপাদনের খুব উপযোগী। উর্বর, হালকা জৈব-ও-উদ্ভিজ্জ-পদার্থ-এবং-লৌহকণিকা-মিশ্রিত দো-আঁশ জমি চা চাষের একমাত্র জমি। চায়ের পাতা হাত দিয়ে তুলতে হয়; তাই এর জন্য চাই সস্তার শ্রমিক। নানা দিক থেকে বিচার করে জলপাইগুড়ি আর দার্জিলিংকে চা চাষের উপযোগী বলে বিচার করা হয়েছে। সেখানে যে সংগঠিত চা-শিল্প গড়ে উঠেছে তা আজ পশ্চিম বাঙলার অন্যতম সম্পদ। মিষ্টি সৌরভের জন্য দার্জিলিঙের চায়ের বাজারে প্রতিপত্তিও খুব বেশী। পশ্চিম বাঙলার প্রায় ২ লক্ষ একর জমিতে চা আবাদ করা হয়। সমগ্র ভারতবর্ষে উৎপন্ন চায়ের প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ উৎপন্ন হয় পশ্চিম বাঙলায়। পশ্চিম বাঙলার চা বেশীর ভাগ হয় দার্জিলিঙে। বাকি হয় কোচবিহার আর জলপাইগুড়িতে।

পশ্চিম বাঙলার ৬৩,০০০ একর জমিতে হয় তামাকের চাষ। জলবায়ু এবং ভৌগোলিক অবস্থার জন্যে জলপাইগুড়ি এবং কোচ-বিহারে সবচেয়ে বেশী তামাকের চাষ হয়। ৪৮,০০০ একর জমিতে তামাকের চাষ হয় এখানে। ভাগীরথী-হুগলীর বাঁ দিকে,—পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং ২৪-পরগনায় ১২,০০০

একর জমিতে তামাকের চাষ হয়। বাকিটা হয় মেদিনীপুরে, বর্ধমানে এবং অন্য জেলায় অল্প-বিস্তর। প্রতি একরে তামাকের গড়পড়তা ফলন ৯'৪ মন।

আখের চাষ সবচেয়ে ভাল হয় মুর্শিদাবাদে, আর দার্জিলিঙে আঁখ একেবারে হয়-ই না। পশ্চিম বাঙলায় মোট ৫৪,০০০ একর জমিতে আখের চাষ হয়। তার ভিতর ১২,০০০ শুধু মুর্শিদাবাদে। তাছাড়া নদীয়া, বর্ধমান, বীরভূমেও বেশ খানিকটা আখের চাষ হয়। সমস্ত পশ্চিম বাঙলায় প্রায় ৭ লক্ষ টন আখ পাওয়া যায়। এখানে ৪টে চিনির কল আছে। কিন্তু মাটি আর জল-হাওয়ার কথা বাদ দিলেও দেখা যায় এখানে আখের চাষ করতে কৃষকের অসম্মতি আছে। তার কারণ, আখের বীজ পুঁততে হয় বর্ষাকালে। কাটবার মতন অবস্থায় আসতে লাগে ন মাস সময়। কাটতে কাটতে শীত জমে আসে তখন। ফলে আখের জমিতে আর বর্ষাকালের অন্য ফসল ফলে না।

এছাড়া নানারকমের ডাল হয় এদেশে। ৯,০৮,০০০ একর জমিতে ডাল বোনা হয়। একর-পিছু ফলন হয় ১০'৪ মন। ১,৩৮,০০০ একর জমিতে হয় সর্ষে, একর-প্রতি ফলন হল ৬'৬ মন। ৯১,০০০ একর জমিতে হয় আলু যার একর-প্রতি ফলন হল ১০২'৮ মন।

সেচ ও জল-বিদ্যুৎ

নদীমাতৃক সুজলা সুফলা বাঙলাদেশ তার মানুষের মুখে অন্ন জোগাতে পারছে না। অভিযোগ করে কৃষক, অভিশাপ দেয় চাকরিজীবী। বাঙলার মাটির উৎপাদিকা শক্তি কমে আসছে। তেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তরের পর থেকেই তো কত বছর কেটে গেল। প্রতিবারই শোনা যায় আকালের পদধ্বনি। হাহাকার ওঠে, আবার মিলিয়ে যায়। নতুন ফসলের মুখ চেয়ে অনাহারী মানুষ আশায় বুক বাঁধে। লোকে বলে মানুষ বাড়ছে, তাই দৈন্যের দশা আর ঘুচবে না। বেকারি বাড়ছে, কৃষির উপর জুলুম চলছে আরো অনেক মানুষকে ভরণ-পোষণের জন্যে। পণ্ডিতেরা বলেন মাটির উৎপাদিকা শক্তি কমে আসছে। কমেছে, ঠিক। কিন্তু কতটা কমেছে জোর করে বলা যায় না। একশ বছর আগের হিসেবে বাঙলার প্রতি একর জমিতে ৩৫ মন ধান পাওয়া যেত। ১৮৭২ সালে একর-প্রতি পাওয়া গিয়েছে ২২ মন। ফ্লাউড কমিশনের মতে বাঙলার ফলনের হার একর-প্রতি ১৮·২ মন যদিও কমিশনের কোনো কোনো সভ্য মনে করেন ১৩ মনের বেশী হবে না। সে যাই হোক একটা কথা ঠিক, ফলনের হার কমছে আর ওদিকে জমির উপর নির্ভরশীলতা ক্রমাগত বাড়ছে। চাষবাসের রীতিনীতিরও পরিবর্তন হয় নি। না দেওয়া হয় ভালো সার, না হয় জমির উপর যত্ন। যখন জলের দরকার তখন জল নেই। অনাবৃষ্টি আর অতিবৃষ্টিতে অজন্মা। খেতে জল দাঁড়াল, থাকল কিছুদিন। পচে গেল শস্য। এ তো পরিচিত ঘটনা।

ইংরেজ রাজারা বলত সেচের দরকার নেই। এমনিতেই ৫০" বৃষ্টি হচ্ছে। তাই সেচ ব্যবস্থার দিকে কোন নজর না দিয়ে বিদেশী প্রভুরা তুলল বাঁধ, বসাল রেলের লাইন। রুদ্ধ হল বন্যার জলের গতি। এই প্লাবনে-বয়ে-আসা পলিমাটি আগে জমত আশপাশের খেতের ধারে, বৃদ্ধি পেত জমির উর্বরতা, তা থেকে বঞ্চিত হল কৃষক। নদীর গতি পালটে দিতে গিয়ে শ্মশানে পরিণত করল ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কাসিমবাজারকে। এইভাবে সর্বনাশের বীজ পোঁতা হল অনেকদিন আগেই।

পশ্চিম বাঙলার নদীর মতি আবার বিচিত্র। যখন খেতে জল দেবার সময়, তখন নদীতে জল থাকে না। নদীগুলো শুকিয়ে যায়, ঝিরঝির করে বয়ে যায় বালির পাশে রুপালি সাপের মতো। বাঁধ দেওয়ার জন্য অনেক নদীর পাড় হয়ে গেছে অনেক উঁচু, অথচ জল ধারা তার খুব নীচুতে। আদিম উপায়ে জলসেচ করা তাই এক্ষেত্রে একান্ত অসম্ভব। আবার যেখানে নদীর পাড় আশপাশের খেতের চেয়ে নীচু, তখনও কৃষকের সমস্যা। খেতের জল টেনে নেয় নদী। বর্ষাকালে এই নদী সুবিধের চেয়ে উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে বেশী। চাষী ভাবতে বসে কখন নামবে এই বন্যার জল। যেখানে নদী খরস্রোতা, দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটে, সেখানে তার এক পাড় ভাঙে, অন্য পাড় গড়ে। কেউ কেউ আবার প্লাবনের বেগে পথ বদল করে। বাঙলার নদী এই অবিবেচনার প্রমাণও দিয়েছে। তাই জলসেচের জন্য বাঙলার কৃষককে বিল-ঝিল-পুকুরের দিকে চেয়ে থাকতে হয়। ১৯৪৩ সালের আগে দামোদরে প্রায়ই বন্যা আসত। বছরের পর বছর বন্যা আসা কোনো রকম আকস্মিক বলে মনে হত না আর। এই বন্যা আসার প্রথম কারণ, দামোদরের বাঁধ বাঁধায় ভুল ছিল।

নদীর পাড় ক্রমাগত উঁচু হতে আরম্ভ করল। জল জমতে থাকল আশেপাশে। আরামবাগের বাঁধ ভেঙে ফেলতে হল। জঙ্গল সাফ করার আত্মঘাতী পরিণাম এই বন্যা আর জমিক্ষয়। সুবর্ণরেখা ও রূপনারায়ণের উপর বাঁধ তৈরী করে নদীর খাদ বালিতে ভরে এসেছে। আর এই জন্যই বন্যা এতদূর ক্ষতি করতে পেরেছে।

নদী তাই বাঙলার কৃষিকে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করতে পারে নি। কিন্তু পরোক্ষভাবে তার দান অসামান্য। নদী থেকে তার দানের পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার করার জন্যই সেচ আর জল-বিদ্যুতের পরিকল্পনা। একদিকে সেচ করে জমিতে সময়মত এবং প্রয়োজনমত জল সরবরাহ করে ভালো ফসল ফলানো যাবে, অন্যদিকে জল থেকে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সস্তায় শক্তি সরবরাহ করা যাবে পশ্চিম বাঙলার শিল্পকে। জল-বিদ্যুৎ তৈরী করতে গেলে চাই নিত্য-প্রবহমান নদী, যেখান থেকে জল তীব্র বেগে বয়ে আসছে। যেখানে নদী সমতল ভূমিতে এসে ঝিমিয়ে পড়েছে, সেখানে নদীতে বাঁধ দিয়ে জলাধার তৈরী করতে হবে। ওই জলে টারবাইন ঘুরিয়ে ডাইনামো চালানো হবে। তাই থেকে উৎপন্ন হবে বিদ্যুৎ।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল, পশ্চিম বাঙলার অনাবাদী ২ লক্ষ একর পতিত জমিতে চাষ করতে হবে, ৫.৫ লক্ষ টন বাড়তি শস্য উৎপাদন করতে হবে। সেচের জল পাবে ২১ লক্ষ একর জমি।

সেচ আর জল-বিদ্যুতের জন্য কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। দামোদর পরিকল্পনায় দশটা জায়গায় বাঁধ দিয়ে বাঙলা এবং বিহারের ১০ লক্ষ একর জমিতে সেচের পরিকল্পনা করা হয়েছে। পশ্চিম বাঙলার ৮ লক্ষ একর জমিতে জলের ব্যবস্থা করবে দামোদর পরিকল্পনা। বর্ধমান,

বাঁকুড়া, হুগলী ও হাওড়ার ভিতর দিয়ে বয়ে যাবে নিত্যবাহী খাল। দুর্গাপুরের ব্যারাজ হবে ২৩০০ ফুট লম্বা। তার দুই দিক দিয়ে দুটো খাল যাবে। একদিকে জলসেচ অন্যদিকে পরিবহন—দুই কাজই চলবে এই খাল দিয়ে। উত্তর দিকের খালটা এখনকার মজা দামোদরের সঙ্গে মিশে পড়বে হুগলী নদীতে। কলকাতার সঙ্গে বাঙলার কয়লা-লোহা শিল্পাঞ্চলের যোগাযোগের আরো সুন্দর পথ হবে বলে আশা করা যায়। আর দক্ষিণ দিকের খাল দিয়ে বর্ধমান, বাঁকুড়া আর হুগলীতে হবে সেচের ব্যবস্থা। সমগ্র দামোদর পরিকল্পনার লক্ষ্য ২৩২ হাজার কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন।

পরিকল্পিত অন্য একটি বাঁধের নাম ফরাক্কা বাঁধ। মালদহ এবং মুর্শিদাবাদের মাঝখানে গঙ্গা পশ্চিম বাঙলার যে অসুবিধে সৃষ্টি করেছে, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই এই বাঁধের পরিকল্পনা। এর নাম হবে ফরাক্কা বাঁধ। এই বাঁধের ফলে ঝিমধরা জলাঙ্গী আর চুর্নী অনেক জল পাবে। মুর্শিদাবাদ আর নদীয়ায় কৃষিকাজের সুবিধে হবে। এই পরিকল্পনার অন্য আর-একটি লক্ষ্য মরা নদী-গুলোতে জীবনের বান আনা। চড়া পড়বার ভয় থাকবে না আর। তখন সোজা কলকাতা থেকে গঙ্গা ধরে বিহারে যাওয়ার কোনো কষ্ট থাকবে না।

আরো একটা উল্লেখযোগ্য বাঁধ বাঁধা হয়েছে তিলপাড়ায়। এটা হল ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার অন্তর্গত। তিলপাড়া হল বীরভূমের সিউড়ি শহরের খুব কাছে। এই পরিকল্পনায় ৬ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা আর ৪০০০ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনুমান করা হয় যে এই পরিকল্পনা সার্থক হলে বীরভূম জেলার ধান উৎপাদন বেড়ে যাবে ৩ লক্ষ টন।

হিমালয় পাহাড় থেকে তিস্তা বিষম বেগে দার্জিলিঙ, জলপাই-গুড়ি, কোচবিহারের মধ্য দিয়ে পূর্বপাকিস্তানের ব্রহ্মপুত্রে এসে মিশেছে। অবিভক্ত বাঙলার আমলে ঠিক হয়েছিল কালিম্পঙ শহরের কাছে তিস্তায় বাঁধ দেওয়া হবে। সেখান থেকে সেচের জলের ব্যবস্থা হবে ৪০ লক্ষ একর জমিতে আর জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে ৩ লক্ষ কিলোওয়াট। কিন্তু পশ্চিম বাঙলা আর পূর্ব বাঙলা দুটো আলাদা রাষ্ট্র হওয়ার দরুন সে পরিকল্পনা আপাতত মুলতুবি আছে। এ ছাড়া মেদিনীপুর খাল দিয়ে হাওড়া আর মেদিনীপুর; দামোদর, ইডেন দিয়ে বর্ধমান আর হুগলা; শালবাঁধ আর আমজোড় খাল দিয়ে বাঁকুড়া; কাশীনালা আর বক্রেশ্বর খাল দিয়ে বীরভূমের জল সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। বাঙলা সরকারের হাতে যে সেচ পরিকল্পনা আছে এবং যার কাজও আরম্ভ হয়ে গেছে তাতে প্রায় ১৩,০২,৪২০ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হবে।

কিন্তু এই সরকারী পরিকল্পনা বাদ দিলেও থাকে বেসরকারী ব্যবস্থা। বেসরকারী খাল দিয়ে, বিল-ঝিল-কুয়ো থেকে যে পরিমাণ জমিতে জলসেচ করা হয় তার দাম খুব কম নয়। সেচের হিসাব তাই ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে। যে জমি ছিল তৃষ্ণার্ত, রুক্ষ কাঁকরে ভরা, তা আজ জলের শীতল স্পর্শ পাচ্ছে।

দেশকে বাড়তে গেলেই বিদ্যুতের দাম দিতে হবে। অতীত থেকে বর্তমানের সেতুপথ বিদ্যুৎ। সমস্ত দেশজোড়া বিদ্যুতের আয়োজন নেই। কলকাতা আর তার চারপাশে পশ্চিম বাঙলার মাত্র ১৮% লোক বাস করে। কিন্তু এই সামান্য লোকের জন্য পশ্চিম বাঙলার ৮৫% বিদ্যুৎ ব্যয় হয়ে যায়। আর বিদ্যুৎ সরবরাহও এখনো প্রধানত ব্যবসাদারের হাতে। ১৯৪৭ সালে

কিলবার্ন কোম্পানির কাছ থেকে সরকার ব্যারাকপুরের বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র কিনে নেয়। তখন থেকে আরম্ভ হয়েছে সরকারী প্রচেষ্টা। এখন সমস্ত পশ্চিম বাঙলার ৩৯টা বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র সরকারের অধীন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এ খুঁব সামান্য।

বাঙলাদেশকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য তিনটে অঞ্চল করা হয়েছে। জলঢাকা আর বালাসান নদীর জলবিদ্যুৎ থেকে উত্তর বাঙলাকে বিদ্যুৎ দেওয়া হবে। কার্সিয়াঙের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ৪০০ কিলোয়াট বিদ্যুতে চা-বাগান অঞ্চল উপকৃত হবে। বালাসান নদীর মুখ থেকে তৈরী হবে ৫,০০০ KVA আর জলঢাকা থেকে হবে ২০,০০০ KVA শক্তি। মালদহ আর পশ্চিম দিনাজপুর পাবে বালুরঘাটের বিদ্যুৎ। ময়ূরাক্ষীতে তৈরী হয়েছে ২,১৭০ ফুট লম্বা আর ১১৩ ফুট চওড়া বাঁধ। এখান থেকে আসবে ২,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ। মামুদবাজার, রামপুরহাট, মোল্লারপুর, সাঁইথিয়া, আহমদপুর, সিউড়ি, দুবরাজপুর, বোলপুর পাবে সেই ময়ূরাক্ষীর বিদ্যুৎ।

১৮৯৭ সালের বিদ্যুৎ আইন পাশ হবার পর কলকাতার ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনের নয়া পত্তন হল। আগে আইনত ৫·৪৬ বর্গমাইল জমিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার ক্ষমতা ছিল কোম্পানির। এখন ৫০০ বর্গমাইল জুড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার অধিকার এসেছে এই কোম্পানির। উত্তর কলকাতাকে নিয়ে ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদকে বিদ্যুৎ সরবরাহের যে ব্যবস্থা হচ্ছে তার প্রধান সরবরাহ কেন্দ্র হল শ্যামনগর। আর দামোদর উপত্যকার বিদ্যুৎ পেয়ে সমৃদ্ধ হচ্ছে বর্ধমান বিভাগ।

ধাতু ও খনিজ

কৃষির ভিত্তি যেমন ভূমি, শিল্পের ভিত্তি তেমনি খনি ও ধাতু। খনিজ সম্পদের ভিতর বাঙলার প্রধানতম সম্পদ হল কয়লা। সবচেয়ে ভালো কয়লার নাম হল অ্যান্থ্রাসাইট। এই কয়লায় কার্বনের পরিমাণ বেশী। এর গুণ হচ্ছে যে এতে আঁচ খুব জোর হয়, অথচ ধোঁয়া হয় না। আর-এক রকমের কয়লা হল বিটুমিনাস। এতে ধোঁয়া আর শিখা হয়। পশ্চিম বাঙলায় বিটুমিনাস কয়লার পরিমাণ বেশী। অ্যান্থ্রাসাইট কয়লা একমাত্র জলপাইগুড়ির জয়ন্তীর কাছে কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়। বাঙলার কয়লার খনি বলতে বোঝায়, আসানসোল মহকুমা, যাকে বলা হয় রানীগঞ্জের কয়লা। কলকাতা থেকে ১৫০ মাইল দূরে এই কয়লার অঞ্চল আরম্ভ হয়েছে। দিগদিগন্তজোড়া ধোঁয়া হাজার চিমনির মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে। কাজে যাচ্ছে কালো কালো আদিবাসী মানুষ। এই কয়লার অঞ্চল ৫০ মাইল বিস্তীর্ণ, দক্ষিণ-পশ্চিমের বিস্তার ২০ মাইল। কয়লা এখানে খুব সহজলভ্য। কয়লার স্তর ৪ ফুট থেকে দু হাজার ফুট গভীর। কয়লার পরিমাণ ১০০০ ফুট পর্যন্ত ৮ কোটি ২০ লক্ষ টন, এবং ২০০০ ফুট পর্যন্ত ২৫ কোটি টন। এ ছাড়া খারাপ জাতের কয়লা অনেক পাওয়া যায়। রানীগঞ্জের কয়লার স্তর বাঁকুড়া ও ও বীরভূমের ভিতর প্রবেশ করেছে। বীরভূমের মোর নদীর উত্তর দিকে টাংসুলিতে আর বাঁকুড়ার বিহারীনাথ ও মেজিয়া পাহাড়ে কয়লার খনি আছে। এ ছাড়া লিগনাইট বা বাদামী কয়লা কিছু

কিছু পাওয়া যায়। পৃথিবীতে যত কয়লা উৎপন্ন হয় তার প্রায় শতকরা দশ ভাগ বাদামী কয়লা। এতে প্রায় শতকরা ৪৫ ভাগ আগুন থাকে। দার্জিলিঙের জয়ন্তী নদীর পশ্চিম দিকে প্রচুর পরিমাণে বাদামী কয়লা আছে। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো অসুবিধে হচ্ছে এই যে এখানকার বাদামী কয়লা আস্ত-আস্ত থান-থান পাওয়া যায় না। ফলে বাইরে চালান দেবার কাজে ব্যবহার করতে গেলেই এই কয়লাকে ইট করে বা অন্য কোনো উপায়ে ব্যবহার করতে হবে। দার্জিলিঙে বাদামী কয়লার পরিমাণ প্রায় ২ কোটি টন।

শক্তিউৎপাদনকারী ধাতুর ভিতর পেট্রলিয়ম প্রধান। মাটির তলার শিলায় সঞ্চিত জীবাশ্ম বা ফসিল থেকে এই তেল পাওয়া যায়। নল লাগিয়ে এই তেল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। তাতে কয়লার চেয়ে খরচ কম পড়ে। আবার দাহিকাশক্তির দিক থেকে এর স্থান কয়লার চেয়ে আরো উঁচুতে। একটা দেশকে শিল্পে সমৃদ্ধ করতে পেট্রল অপরিহার্য। সৌভাগ্যের কথা, সম্প্রতি সুন্দরবনে পেট্রলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

একটা দেশের শিল্প গড়ে তুলতে হলে শক্তির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। সেই শক্তির উৎস হল কয়লা, পেট্রল আর জলবিদ্যুৎ। এখন জোর করে বলা যায় পশ্চিম বাঙলায় কয়লা আর জলবিদ্যুৎ অঢেল। কেবল সুন্দরবনের অভিযান সার্থক হলেই হবে সোনায় সোহাগা।

পশ্চিম বাঙলায় হেমাটাইট লোহা পাওয়া যায়। পৃথিবীতে মোটামুটি ভাবে চার রকমের লোহা দেখতে পাওয়া যায়। হেমাটাইট লোহার রঙ লাল ও উজ্জ্বল। হেমাটাইটে সাধারণত শতকরা ৬০ ভাগ লোহা থাকে। কিন্তু এদেশের হেমাটাইটে আছে ৬২ থেকে ৭০ ভাগ লোহা। আসানসোলের কয়লার অঞ্চলে, বীরভূমে ও

বাঁকুড়ায় এই লোহা পাওয়া যায়। বার্নপুর, কুলটি এবং বরাকরে লোহার কারখানা গড়ে উঠেছে। এসব কারখানার চাহিদা শুধু এ অঞ্চলের লোহায় মেটে না। বিহার ও ময়ূরভঞ্জ থেকে আরো লোহা আনতে হয়। জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিঙে কিছু কিছু লোহা পাওয়া যায়। জাতীয় উন্নতিতে লোহা আর ইস্পাত অপরিহার্য বলেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই শিল্পকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা হচ্ছে।

অভ্র, তামা, গ্রাফাইট কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যবসা করার মতো বেশী নয়, তাই এরা পরিত্যক্ত হয়েই আছে। দার্জিলিঙ এবং জলপাইগুড়িতে এদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু মোটামুটি লাভজনক ব্যবসা চলেছে সোপস্টোন আর স্যাণ্ডস্টোন নিয়ে। সোপস্টোন দেখতে সাদা, সাবানের মতো মসৃণ। গায়ে মাথার পাউডারে এর ব্যবহার হয়, আর সাবানে ভেজাল দিতে এর দরকার পড়ে। মূর্তি গড়তে, বাসন তৈরী করতে সোপস্টোনই ব্যবহার্য। মেদিনীপুরের বীনপুর থানায় সোপস্টোন পাওয়া যায়। স্যাণ্ডস্টোন বা বেলে পাথর সাধারণত ঘরবাড়ির কাজে লাগে। বালিকে আমরা কোনো আমল দিই না। কিন্তু খোঁচা-খোঁচা মোটা দানার বালি কংক্রিট বা পলেস্তরা করতে খুব কাজে লাগে। কাচের জন্যও এই বালির প্রয়োজন। দামোদর, অজয়, আর বরাকরের পাড়ে এই বালির ভাণ্ডার। খাদানের গর্ত ভরাট করতেও এই বালির দরকার হয়। তা ছাড়া আছে চীনামাটি। রানীগঞ্জে এই মাটি পাওয়া যায়। চীনামাটির বাসন আমাদের বড়ো পরিচিত জিনিস। চীনামাটি ছাড়া রানীগঞ্জে ফায়ার ক্লে পাওয়া যায়। এই ফায়ার ক্লে থেকে ফায়ারব্রিক তৈরী হয়।

শিল্পাঞ্চল

একাধিক অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে বিশেষ ধরনের শিল্প বিশেষ একটা এলাকায় দানা বাঁধে, বিস্তার লাভ করে। একই জাতের শিল্প যদি একই এলাকায় সংগঠিত হয় তবে উৎপাদনের দিক থেকে যেমন সুবিধা, উৎপন্ন পণ্যের পরিবেশনের দিক থেকে তেমনি সুবিধা। কাঁচামাল, বিশেষ ধরনের কাজের জন্যে বিশেষ-অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন মজুর, যানবাহনের সুবিধা, আবহাওয়ার আনুকূল্য এবং আরো অনেক কার্য-কারণের যোগাযোগের ফলে একটা বিশেষ এলাকায় একটা বিশেষ শিল্প সংগঠিত হয়। পশ্চিম বাঙলায়ও তাই হয়েছে।

উত্তরে দার্জিলিঙ-জলপাইগুড়ির চা-শিল্প ; পশ্চিমে আসানসোল-রানীগঞ্জের শিল্পাঞ্চল ; হুগলী নদীর ধারে ত্রিবেণী আর কাঁচড়া-পাড়া থেকে বজবজ আর বাউড়িয়া জুড়ে আরো একটা বিরাট শিল্পাঞ্চল ; আর ওদিকে খড়্গপুরে রেলওয়ে কারখানা। পশ্চিম বাঙলার শিল্প মোটামুটি এই চারটে এলাকায় বড়ো হয়ে উঠেছে। এগুলো হল বৃহৎ শিল্প। এদের জন্য লোহা চাই, কয়লা চাই, চাই প্রচুর পরিমাণে শক্তি। এদের ভিত্তি দৃঢ়, সুসংগঠিত। বিশ্ববাজারের ওঠানামার সঙ্গে এদের নাড়ীর টান। কিন্তু এই শিল্প অপেক্ষাকৃত হাল আমলের। এরও আগে থেকে যে শিল্প বাঙলার মাটিতে গড়ে উঠেছিল, বাঙলার কৃষিপ্রধান অর্থনীতির সঙ্গে বোঝাপড়া করে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল তা হল প্রধানত কুটির শিল্প বা পল্লী শিল্প।

সমতল নিম্নভূমি, স্বাস্থ্যকর জলবায়ু, শিল্প অঞ্চলকে অন্ন যোগাবার জন্য শস্যের জমি, এইসব দিক থেকে আসানসোল-রানীগঞ্জ অঞ্চল অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক সব সুবিধাগুলো পেয়েছে। এ অঞ্চলে কয়লা, লোহা, অ্যালুমিনিয়ম, চীনামাটি, ইট প্রভৃতি শিল্প প্রধান। এইসব শিল্প গড়ে উঠেছে প্রধানত কয়লাকে কেন্দ্র করে। কোক কয়লা এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। রেলপথ এবং যানবাহনের উপযুক্ত আয়োজন—রেলপথের সংযোগ একদিকে কলকাতার বন্দরের সঙ্গে, অন্যদিকে খনি অঞ্চলের সঙ্গে। কাঁচামাল সরবরাহের তাই কোনো ভাবনা নেই। বাঙলাদেশে যে পরিমাণ লোহার যোগান, তাতে আসানসোলের মতো শিল্পাঞ্চল ভরসা করে থাকতে পারে না। কিন্তু ভরসা হারাবার ভয় নেই—হাতের কাছেই সিংভূম, কেঁওজোর, ময়ূরভঞ্জের আকরিক লোহার আড়ত। চীনামাটির বাসনের জন্য এবং ধাতু নিষ্কাশনের জন্য যে মাটির দরকার তা পাওয়া যায় শিল্পাঞ্চলের সীমায়, অণ্ডালে আর বীরভূমে। তাই একদিকে শক্তি উৎপাদনের উৎস কয়লা, অন্যদিকে কাঁচামাল ঘরের দোরে। সস্তায় শ্রমিকের ভাবনা নেই—পাশেই সিংভূম-মানভূম-সাঁওতাল পরগনার মানুষ। দলে দলে আসে কাজের ক্ষুধায়। জলবায়ু আবার শিল্পের পক্ষে অনুকূল। এখনকার আবহাওয়া না খুব রুক্ষ, না খুব আর্দ্র। শ্রমিকের কর্মক্ষমতা তাই এখানে বাড়ে। এই শ্রমিককে আর মালিককে যদি খাদ্যশস্যের কথা ভাবতে হত, তা হলে উৎপাদন-ক্ষমতা নিশ্চয়ই পড়ে যেত। কিন্তু তা ভাবতে হয় না। পাশেই বাঁকুড়া আর বর্ধমানের গ্রামগুলো বস্তায় বস্তায় ধান-চাল এনে ঢেলে দিচ্ছে এ অঞ্চলে। অজয়, দামোদর, বরাকরের নদীর চর থেকে আসছে অঢেল বালি, ভর্তি হচ্ছে কয়লার খাদ।

লোহা-শিল্পের ভিতর ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি আর হীরাপুরের স্টীল করপোরেশন অফ বেঙ্গল প্রধান। আগে এরা ছুটো আলাদা প্রতিষ্ঠান ছিল। ১৯৫৩ স্যালের পয়লা জানুয়ারি থেকে এ ছুটো প্রতিষ্ঠান একত্র হয়ে একটা প্রতিষ্ঠান হয়েছে। আশা করা যায় এই যৌথ প্রচেষ্টা এদেশের লোহার প্রয়োজনের অনেকখানি মেটাতে পারবে। এখান থেকে ইস্পাত পাওয়া যাবে ৭০০,০০০ টন এবং কাঁচা লোহা ৪০০,০০০ টন।

এখানে কয়লা শুধুমাত্র খনিজ সম্পদ নয়; উন্নত শিল্পও। এখানে কয়লাখনির সংখ্যা ২০৫। বছরে গড়ে ৯০০,০০০ টন থেকে ১,০০০,০০০ টন কয়লা ওঠে এই অঞ্চল থেকে। ১৭৭৪ সালে জানতে পারা যায় যে রানীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লা আছে। সেই থেকে মাটি খোঁড়ার কাজ আরম্ভ হয়। ১৮৩০ সালে প্রথম কোলিয়ারি স্থাপিত হয় রানীগঞ্জে। সেই থেকে জয়যাত্রা আরম্ভ হয়েছে।

সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অ্যালুমিনিয়ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া। কারখানাটি যদিও অল্প দিনের তবু এর উৎপাদনক্ষমতা বিস্ময়কর। ১৯৫০ সালে এই কারখানা থেকে উৎপন্ন হয়েছে ১২০০ টন অ্যালুমিনিয়মের পাত। বিহারের লোহারডাগা আর পালামৌ এখানে কাঁচামাল সরবরাহ করে। এখানে কাজ করে ১৪৮৩ জন মজুর।

রানীগঞ্জের টালি খুবই বিখ্যাত। কয়েকটা সুবিধাজনক ভৌগোলিক কারণের জন্য টালি-শিল্প এ অঞ্চলে দ্রুত সংগঠিত হয়েছে। একা বার্ড কোম্পানির কারখানা রানীগঞ্জে চারটে, দুর্গাপুরে একটা। বার্ড ছাড়া আরো বহু প্রতিষ্ঠান আছে। শুধু টালি-শিল্পে দৈনিক দু হাজার মজুর কাজ করে। টালি, ইট, পাইপ, চীনেমাটির জিনিস এসব কারখানা থেকে বাজারে আসে। এরই সঙ্গে কাচ ও সিমেণ্ট

কারখানার জন্য দরকারী আরো কতকগুলো জিনিসপত্র এরা তৈরি করে।

রানীগঞ্জে বেঙ্গল পেপার মিল একটা বড়ো কাগজের কল। এখানে ২,০৫০ জন শ্রমিক কাজ করে। উৎপাদনের পরিমাণ ১১,৪১২ টন কাগজ।

বিহার-বাঙলার সীমান্তে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস এদেশে রেল ইঞ্জিন তৈরী করার জন্য স্থাপিত হয়েছে। সরকারী এই প্রতিষ্ঠানের পত্তন হয় ১৯৪৮ সালে। এখান থেকে প্রথম রেল ইঞ্জিন বেরিয়ে আসে ১৯৫১ সালে। ইতিমধ্যে এই কারখানায় ১০০টা ইঞ্জিন তৈরী হয়েছে।

পশ্চিম বাঙলার অন্য একটা বিখ্যাত এবং বনেদী শিল্পাঞ্চল হল হুগলী নদীর দুই পাড়—হাওড়া, হুগলী, কলকাতা আর চব্বিশপরগনা নিয়ে এ অঞ্চলটা। লম্বায় বেশী—একমাত্র নদীর ধারেই কলগুলোর অবস্থান। এরা স্ফীত হয়ে গ্রামের দিকে ছড়িয়ে পড়ে নি, বরং যখন প্রয়োজন পড়েছে তখন সে হুগলীর ধারেই জায়গা খুঁজেছে। তার কারণও আছে। এ অঞ্চলের প্রথম এবং প্রধান লাভ হল কলকাতা বন্দর: আমদানি-রপ্তানির সুবর্ণ সুযোগ, অথচ খরচ কম। বড় বড় গুদাম রয়েছে, রয়েছে প্রশস্ত রাজপথ। দরের ওঠা-নামার সুযোগ-সুবিধার জন্য অপেক্ষা করা ইত্যাদি ব্যবসাদারী দাবাখেলায় চালের কৌশল দেখাবার মতো জায়গা কলকাতা ছাড়া আর কোথায় বা পাওয়া যাবে? এ অঞ্চলের পশ্চিম প্রান্তসীমায় আছে ত্রিবেণী, অন্য পারে নৈহাটি-কাঁচড়াপাড়া। মাঝখানে হুগলী নদী। পাশ দিয়ে ট্রাঙ্ক রোড। ছোটো ছোটো স্টীমারের বার্জে বোঝাই-করা মাল এক দিকে জল ঠেলে আসবে কলকাতার বন্দরে, অন্য দিকে ট্রাকে

শ্রমিক-পল্লী

করে আসবে ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে। তার উপর সবচেয়ে সুবিধে দিয়েছে কলকাতার ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি। সস্তা দরে কোম্পানি-গুলোকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে যেন দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে শিল্প-গুলোকে। শ্রমিকদের দিক থেকে সুবিধে অনেক। একই জাতের শিল্প আছে, আর আছে নানা ধরনের শিল্প। বহুবিধ উপশিল্প থাকার জন্য নানা রকমের ব্যবসায়ী প্রচেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। তাই কলকাতা-কেন্দ্রিক এই বিরাট শিল্পাঞ্চল ক্রমাগত জটিল হয়ে উঠছে।

এই অঞ্চলের সবচেয়ে নামকরা শিল্প চট। হুগলীর দুই ধারে এই চটকল প্রায় তিন লাখ মজুরের শ্রমে উৎপাদন করছে চট, থলে ও অন্যান্য সামগ্রী। সমগ্র ভারতবর্ষের মোট ১১২টা চটকলের ভিতর ১০১টা কল শুধু পশ্চিম বাঙলায়—৬০ মাইল লম্বা পরিসরের

ভিতর ভারতবর্ষের প্রায় শতকরা ৯৮ ভাগ পাট-শিল্পের উৎপাদন। এই শিল্পের বৈশিষ্ট্য হল এই যে উৎপন্ন দ্রব্য একেবারে রপ্তানির জন্য উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যের শতকরা ২৭ ভাগ হল চট। পৃথিবীর বাজারে পাটের একচ্ছত্র রপ্তানিকারক ভারতবর্ষ দেশ-ভাগের পর খুব অসুবিধায় পড়েছে। কারণ পশ্চিম বাঙলায় পাটের কল থাকলেও কাঁচামাল নেই। পাট-উৎপাদনকারী জেলাগুলো প্রায় সব পড়েছে পূর্ব পাকিস্তানে। শিল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় পাটের পরিমাণ হল বছরে প্রায় ৫৮·৯২ লক্ষ বেল। প্রতি বেলের ওজন প্রায় ৫ মন। এত পাট কোথায় পাবে পশ্চিম বাঙলা? তাই পশ্চিম বাঙলার কৃষককে লুব্ধ করা হয়েছে পাট চাষ বাড়ানোর জন্যে। কাঁচাটাকার লোভে ধানের জমিতে পড়ছে পাটের বীজ, কৃষি-সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে। এখন পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে ব্যবসার চুক্তি হয়েছে। সেই চুক্তি অনুসারে পাকিস্তান ভারতবর্ষকে দেবে বছরে ৩৫ লক্ষ বেল কাঁচা পাট। প্রতিদানে ভারতবর্ষ পাকিস্তানকে দেবে পাটজাত শিল্প আর কয়লা। পশ্চিম বাঙলার চটকলে প্রায় ২,৬০,০০০ পুরুষ এবং ৪২,০০০ মেয়ে শ্রমিক কাজ করে।

পশ্চিম বাঙলায় তুলো হয় না। তবু হুগলী নদীর ধারে কয়েকটা কাপড়ের কল দেখতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে মোট কাপড়ের কলের সংখ্যা হল ৪২৫টা। তার ভিতর পশ্চিম বাঙলায় স্থাপিত কাপড়ের কলের সংখ্যা হল ৩১। এখানে ৩৩,০০০ শ্রমিক চালায় ৩,৮১,১১৬ টাকু আর ৮৮০৩ তাঁত। এদের অধিকাংশকে দেখা যাবে হুগলী নদীর ধারে,—মেটিয়াবুরুজ, সোদপুর, পানিহাটি, শ্রীরামপুর ও রিষড়ায়। এই কল থেকে যত কাপড় উৎপাদন করা হয় তা পশ্চিম বাঙলার প্রয়োজন মেটাতে পারে না। প্রয়োজনের এক-পঞ্চমাংশ

উৎপন্ন হয় মাত্র। কিন্তু তাও আবার বাঙলাদেশে থাকতে পায় না; বিহার, উড়িষ্যা আর আসামের চাহিদা মেটানোর জন্য তাদের রপ্তানি করা হয়। কিন্তু পশ্চিম বাঙলায় তুলো উৎপন্ন না হওয়া সত্ত্বেও ৩১টা চালু কাপড়ের কল থাকা একটু রহস্যময় বৈকি! রহস্য হল কলকাতার বন্দর। তুলো আমদানি করা খুব সহজ; যন্ত্রপাতি যোগাড় করার কোন ভাবনা নেই। অল্প খরচায় বিদেশ থেকে কাঁচামাল আর যন্ত্রপাতি আমদানি করা হচ্ছে। অন্যদিকে আছে ঝরিয়া-রানীগঞ্জের কয়লা, ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানির বিদ্যুৎ। প্রকৃতি আবার এই বিশেষ শিল্প সৃষ্টির অনুকূল। এখানকার জলবায়ু সুতো তৈরী ও বুনবার কাজে বেশ সাহায্য করে। তার উপর আছে বাঙলার শ্রমিক। এদের সরু সরু আঙুলগুলো ত্বরিতগতি। হয়তো বহুদিন আগেকার বাঙলার বস্ত্রশিল্পের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য মনের গোপনে কাজ করে বলেই রোগজীর্ণ বাঙালী শ্রমিক সুতোকলে এত অপরিহার্য। উৎপাদনের দিক থেকে পশ্চিম বাঙলা তাই যেমন ভাগ্যবান, তেমনি পয়মন্ত বাজারের ব্যাপারে। বিহার, উড়িষ্যা আসাম জুড়ে পশ্চিম বাঙলার বিপুল বাজার পড়ে আছে। ওদেশে কাপড়ের কল নেই। পশ্চিম বাঙলা তাই যেমন একদিকে দিতে পারবে শৌখিন কাপড়, অন্যদিকে দিতে পারবে নিত্য-প্রয়োজনীয় ধুতি-শাড়ি। তাই পশ্চিম বাঙলা কাপড়ের কলে এখনো যথেষ্ট উন্নতি করতে পারে, অন্তত সম্ভাবনা তার পুরোপুরি।

এ অঞ্চলের আরো একটা উন্নত শিল্প হল কাগজের কল। তার ঐতিহ্যও আছে। ভারতবর্ষে প্রথম কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হয় এই গঙ্গার ধারে,—কলকাতা থেকে আট মাইল উত্তরে বালীতে। ঐ কারখানায় তখন তৈরী হত বাদামী রঙের কাগজ। কিন্তু বেশীদিন

টিঁকে থাকতে পারে নি সেই কারখানা ; উঠে গেল। তারপর কলকাতা থেকে তেরো মাইল উত্তরে হুগলী নদীর ধারে, টিটাগড়ে তৈরী হল কাগজের কল। বহু ঝড়ঝাপটা, মন্দা-আক্রার বাজার পার হয়ে কাগজ-শিল্প আজ ভারতবর্ষে স্ব-প্রতিষ্ঠ। যে সংশয় দ্বিধা কাগজ শিল্পের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছিল, আজ তা নেই। আজ সে 'কুইক মার্চ' করে ভারতবর্ষের প্রয়োজন মেটানোর মতো স্বাবলম্বী হতে চলেছে। সমস্ত ভারতবর্ষে কাগজের কলের সংখ্যা হল ১৯। তার মধ্যে পশ্চিম বাঙলায় আছে ৬টা কল। এদের মিলিত উৎপাদন-ক্ষমতা ১ লাখ টন। ঘাস, বাঁশ, কাঠ, ছেঁড়া কাগজ ইত্যাদি থেকে কাগজ উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষে কাঁচামাল প্রায় সবই পাওয়া যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই শিল্পের ভীষণ দুর্বলতা হল, শিল্পের জন্য অপরিহার্য রসায়ন, যথা কস্টিক সোডা, ব্লিচিং পাউডার, সোডা, রং ইত্যাদি ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয় না, বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। আবার ভারতবর্ষে প্রচুর নরম কাঠ থাকা সত্ত্বেও কাগজের মণ্ড বিদেশ থেকে কিনে আনতে হয়। কিন্তু এ সব দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও কাগজের কল পশ্চিম বাঙলার গৌরব বাড়িয়েছে। আবার পশ্চিম বাঙলার ৬টা কাগজের কলের ভিতর পাঁচটা হুগলী নদীর ধারে। টিটাগড় পেপার মিল এখন দুটো ; এক নম্বর আর দু নম্বর। ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাগজের কল এটা। উৎপাদন-ক্ষমতায় এর স্থান সবার উপরে—বছরে প্রায় ৩৩ হাজার টন। হালিশহর আর নৈহাটিতে আছে ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প কোম্পানি ; বছরে ৬ হাজার টন কাগজ তৈরি করে। ত্রিবেণী টিস্যু লিমিটেড উৎপন্ন করে ৩'৫ হাজার টন। টিটাগড়ের কাগজের কলে ঘাস আর ছেঁড়া কাপড় দিয়ে কাগজ তৈরী হয়ে আসছে। সম্প্রতি সেখানে খড় থেকে কাগজ তৈরী করা হচ্ছে,

আর নৈহাটির পেপার পাল্পে কাগজ হচ্ছে বাঁশ থেকে। কিন্তু এখনো অবধি বিদেশ থেকে কাগজ কিনে আনতে হয়। ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনায় ভারতবর্ষকে স্বাবলম্বী হতে হবে, তাই উৎপাদন বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেই হিসেবে ধরা হয়েছে যে এখন যেমন টিটাগড় পেপার মিল বছরে ৩৩ হাজার টন কাগজ উৎপাদন করছে, তাকে করতে হবে ৪০ হাজার টন, বেঙ্গল পেপার মিল করবে ১৪ হাজার টন। এ ছাড়া ভারত সরকারের নতুন কাগজের কল বসাবার পরিকল্পনা আছে, তার ভিতর পশ্চিম বাঙলায় হয়তো কার্ড-বোর্ডের জন্য একটা কারখানা বসতেও পারে।

রানীগঞ্জ-আসানসোলের মতো হুগলী অঞ্চলে লোহা-শিল্প প্রাধান্য স্থাপন করতে পারে নি; কিন্তু এ অঞ্চলেও লৌহজাত শিল্প নিয়ে নামজাদা ইনজিনিয়ারিং ফার্ম গড়ে উঠেছে। হাওড়া আর ২৪ পরগনা এজন্যে বিশেষ বিখ্যাত। হুগলী অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত ইনজিনিয়ারিং কলের সংখ্যা হল ১৮টা। এ সমস্ত কারখানায় ইস্পাতই কাঁচামাল। এদের মধ্যে কয়েকটায় ঢালাই লোহা থেকে ইস্পাত তৈরি করা হয়। এ দেশ যতই দ্রুত পায়ে শিল্পোন্নতির পথে এগিয়ে যাবে, ততই প্রয়োজন হবে তার যন্ত্রপাতির। শিল্পপ্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতির জন্য যদি বিদেশীর দরজায় হাত পেতে থাকতে হয়, তবে সার্থক শিল্প প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। তাই নতুন নতুন যন্ত্রপাতি তৈরি করা অপরিহার্য বলেই নতুন কারখানা প্রতিষ্ঠার কথা সরকারের বিবেচনাধীন। এই প্রসঙ্গেই টেক্সম্যাকো আর ন্যাশনাল আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল করপোরেশনের নাম করতে হয়। কাপড়ের কলের জন্য আর বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষবাস বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরি করছে এরাই।

এ ছাড়া বেলুড়ে রয়েছে ছুটো অ্যালুমিনিয়মের কারখানা। ইণ্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়ম করপোরেশন খনিজ অ্যালুমিনিয়ম থেকে তৈরি করছে অ্যালুমিনিয়মের পাত, চালান দিচ্ছে বাঙ্গালোরে—হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফ্ট কোম্পানির কাছে। উড়োজাহাজের পাত তৈরি হচ্ছে ঐ পাতে। আর ক্রাউন অ্যালুমিনিয়ম কোম্পানি তৈরী করে অ্যালু-মিনিয়মের বাসনপত্র। কিন্তু ভারতবর্ষে অ্যালুমিনিয়মের যা পাত তৈরী হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাই বিদেশ থেকে কিনে আনতে হয় প্রয়োজনীয় পাত। যা হোক, এই অ্যালুমিনিয়মের বাসনপত্র তৈরী করার আর-একটা কারখানা আছে ২৪ পরগনায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে পশ্চিম বাঙলায় দ্রুত গড়ে উঠেছে রবারের কারখানা। খাস পশ্চিম বাঙলায় রবার চাষ হয় না বললেই হয়। মাত্র ·০০৯ হাজার একর জমি পড়েছে রবার চাষের আওতায়। কিন্তু হলে হবে কি! ভারতবর্ষের রবার-শিল্পে পয়লা নম্বর জায়গা দখল করে আছে পশ্চিম বাঙলা। মূলধনে, নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যায়, উৎপাদনের হারে—এখনো কেউ তাকে হটাতে পারে নি। রাঘব-বোয়ালদের ভিতর পড়ছে ডানলপ, বাটা, বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ, ইণ্ডিয়া রবার ম্যানুফ্যাকচারিং ইত্যাদি। মোটর আর সাইকেলের টায়ার-টিউব থেকে আরম্ভ করে, নিত্যব্যবহার্য জিনিস এবং ডাক্তারির প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উৎপন্ন হয় এইসব কারখানায়। হুগলী অঞ্চলে ছোটোবড়ো রবার কারখানার সংখ্যা ত্রিশ।

যুদ্ধের পরে আর যে শিল্প গড়ে উঠেছে তা হল মোটরগাড়ির। ইঞ্জিন-সমেত পুরা কোনো গাড়ি এখনো তৈরী হচ্ছে না। এসব কারখানার মোদ্দা কাজ হল বিদেশ থেকে মোটরগাড়ির যন্ত্রপাতি কিনে নিয়ে এসে এখানে বিভিন্ন অংশকে একত্রিত করা। হুগলী

অঞ্চলে কোন্নগরের কাছে আছে হিন্দুস্থান মোটর কোম্পানি। অবশ্য এখন জোড়া দেওয়ার কাজ ছাড়াও কয়েকটা যন্ত্রপাতি তৈরী হতে আরম্ভ করেছে। মোটরগাড়ি ছাড়া আছে সাইকেল কোম্পানি,—হিন্দ সাইকেল ওয়ার্কস। উষা কোম্পানিতে তৈরী হচ্ছে সেলাইএর কল।

এ অঞ্চলে ১৯টা দেশলাই-এর কারখানা আছে। দেশলাই কাঠির জন্য যে কাঠের দরকার পশ্চিম বাঙলায় তার অভাব নেই। কিন্তু বারুদ তৈরি করার জন্য যে সব রসায়নের দরকার, তা আমদানি করতে হয় বিদেশ থেকে। সেজন্য দেশলাইয়ের যে সব কারখানা গড়ে উঠেছে তা স্বভাবতই থাকবে বন্দরের কাছেপিঠে। এদের ভিতর দক্ষিণেশ্বরে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া ম্যাচ ফ্যাক্টরিটা সবচেয়ে বড়ো। এ কারখানা সুইডেনের টাকায় তৈরী, তারাই এর মালিক।

তা ছাড়া আরো কয়েকটা শিল্পের ভিতর রসায়ন-শিল্প বেশ নাম করেছে। রেশম-শিল্প মূলত কুটির-শিল্প হলেও খড়দহ আর পানিহাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রেশম-শিল্পের কারখানা। কাঁচড়াপাড়া আর লিলুয়ায় আছে রেলের কারখানা।

সোদপুর, উল্টাডাঙা আর কলকাতার মানিকতলা অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যাবে কাচের কারখানা। সাধারণ কাচের জিনিসপত্র থেকে বৈজ্ঞানিকের কাজে-লাগা যন্ত্রপাতি তৈরী হচ্ছে এ-সব কারখানায়। সোদপুর, বেলঘরিয়া, এন্টালিতে আছে মৃৎশিল্পের কারখানা। পলতায় গড়ে উঠেছে এনামেল ফ্যাক্টরি। ভারতবর্ষের চাহিদা মেটাতে ঐ কারখানা পিছিয়ে পড়ে নেই। যুদ্ধের সময় অবশ্য উৎপাদন কমে গিয়েছিল, কিন্তু এখন সে গৌরব ফিরে পেয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদের কারখানা রয়েছে ইছাপুর আর কাশীপুরে।

আগে ধানকল সংখ্যায় ছিল প্রচুর। ১৯৪৩ সাল থেকে সরকার ধানচালের ভার নিজের হাতে নিয়ে নিল, তখন থেকে ধানকল-গুলোর শনির দশা আরম্ভ হল। আজকে আবার তারা যদিও কিছুটা সামলে নিয়েছে, কিন্তু আগের অবস্থায় পৌঁছতে পারে নি। এই শিল্পের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল—ধান কোথায় পাওয়া যাবে। অবিভক্ত বাঙলায় উৎপন্ন ধানে কুলিয়ে যেত, এখন সে উপায় নেই।

এ-ছাড়া আছে বহু রকমের শিল্প আর উপশিল্প। ফ্যাক্টরি আইনের আওতায় পড়ে এমন শিল্পের সংখ্যা শুধু পশ্চিম বাঙলায় হল ১২৪৫। এ হিসাব ১৯৪৭ সালের। শুধু হুগলী অঞ্চলে এ ধরনের শিল্পের সংখ্যা হল ১০০০। তাই সহজে অনুমান করা যায়, এ অঞ্চলে কাজের আর মানুষের চাপ কত বেশী। পৃথিবীতে যতগুলো কর্মমুখর শিল্পাঞ্চল আছে, হুগলী তাদের ভিতর একটা। হুগলী নদীর দুই পারে, ত্রিবেণী-কাঁচড়াপাড়া থেকে আরম্ভ করে বজবজ-উলুবেড়িয়ার ভিতর সীমাবদ্ধ অঞ্চলে এতগুলো কারখানা আশপাশের কৃষি অঞ্চলের ওপর যেমন চাপ এনেছে তেমনি বেড়ে গেছে বিপদের সম্ভাবনা। তাই এই শিল্পাঞ্চলকে আরো চারপাশে ছড়িয়ে দেবার প্রশ্নটা জরুরী সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে।

পশ্চিম বাঙলার আর-একটা বিখ্যাত শিল্পাঞ্চল হল দার্জিলিঙ আর জলপাইগুড়িতে। রানীগঞ্জ-আসানসোলের মতো পাহাড়ের গায়ে চিমনির ধোঁয়া নেই; হুগলী অঞ্চলের মতো জড়াজড়ি করে নেই কারখানা; ধোঁয়ার পাথর দিয়ে ভরাট করা থাকে না আকাশ। এখানে নীল আকাশে হাজার মেঘের ভেলা এক পার থেকে চলেছে অন্য পারে। গাঢ় সবুজ পাহাড়ের বুকে রুপালি হারের মতো পাহাড়ী নদী। পাহাড়ের গায়ে দেখা যাবে মানুষ—পিঠে ঝুড়ি বেঁধে কী

যেন তুলছে। এখানে হাঁকডাক নেই ; যন্ত্রের গর্জনে কানে তালা লাগে না। অথচ এই নিবিড় স্তব্ধতায় ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প বিদেশ থেকে বিনিময়-মুদ্রা নিয়ে আসছে। এই নিঃশব্দচারী অঞ্চল পশ্চিম বাঙলার চা অঞ্চল। ২ লক্ষ একর জুড়ে এই শিল্পাঞ্চল ভারতবর্ষের মোট চা উৎপাদনের ২৫ ভাগ তৈরি করবার দায়িত্ব নিয়েছে। শুধু তাই নয়,—দার্জিলিঙের চায়ের নাম আছে পৃথিবী জুড়ে। এখানকার চায়ের গন্ধ মন মাতায়। তাই রপ্তানির বাজারে কৌলীন্যের গর্ব নিয়ে দার্জিলিঙ-জলপাইগুড়ি চা অঞ্চল গর্বিত। আর এ গর্ব তার অনেক দিনের।

ইতিহাসটা দু-চার কথায় বলি।

সেটা ১৭৯০ থেকে ১৮০০ সালের কথা। কর্নেল কিড তখন শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের অধ্যক্ষ। ভারতবর্ষে চা চাষ করতে হবে। কোথায় করা যাবে? চা চাষের পক্ষে কোন জায়গাটা হবে উপযোগী? প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। দার্জিলিঙ—ওখানকার জমিতে ফলবে চায়ের ফলন। কাজও হল শুরু। সেটা হল ১৮৪৫ সালের কথা। ১৮৭৪-৭৫ সালে চা চাষ হতে আরম্ভ করল জলপাইগুড়িতে। সরকারী সাহায্য ছিল অকৃপণ। বিশেষ সুবিধা দিয়ে জমি বিলি করা আরম্ভ হল। এই করে পশ্চিম বাঙলার চা-শিল্পের প্রথম পদক্ষেপ। তারপর নিজগুণে পৃথিবীর বাজারে নিজস্ব স্থান দখল করে নিল। এখন পশ্চিম বাঙলায় মোট ২৯৮টা চা বাগান ও কারখানা।

চা ছাড়া এখানকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল কাঠচেরাই কল। নিকটেই পশ্চিম বাঙলার বনসম্পদের সবচেয়ে বড়ো উৎস। জঙ্গল থেকে আনা হয় কাঠের গুঁড়ি। জমা হয় রেল-স্টেশনের ধারে।

সেখান থেকে ট্রেনে করে কাঠের কলে এনে ফেলা হয়। কাঠ চেরাই-এর জন্য সনাতন ও নতুন দুই পন্থাই সচল। এখানে দিনে প্রায় ১০০০ ঘন ফিট কাঠ চেরাই হয়। এ ছাড়া কাঠকয়লা তৈরি করা কিংবা কুকরী, ছুরি, কাঁচি ও তাঁতের কাপড় ইত্যাদি কুটির-শিল্পের ভিতর এসে পড়ে।

পশ্চিম বাঙলার আর-একটা শিল্পাঞ্চল খড়্গপুরকে কেন্দ্র করে। কিন্তু খড়্গপুর মূলত রেলের কারখানাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তা ছাড়া এ অঞ্চলে আছে ধানের কল। শিল্পাঞ্চল বলতে সাধারণত যা বোঝায়, খড়্গপুর তা নয়। এখানে একটা শিল্প গড়ে উঠেছে মাত্র। একে কেন্দ্র করে আরো কয়েকটা বনেদী শিল্প গড়ে উঠবে এমন সম্ভাবনা আপাতত নেই। তবু এখানে স্থাপিত হয়েছে একটা টেকনিক্যাল স্কুল।

ঘননিবদ্ধ শিল্পাঞ্চল বাদ দিয়েও বাঙলার সমভূমিতে আরো কয়েকটা কলকারখানা নজরে পড়ে। এত বড়ো শিল্পসমৃদ্ধ হুগলী অঞ্চলে চিনির কল নেই। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ আর জলপাইগুড়িতে একটা করে চিনির কল আছে। এরা আধুনিক যন্ত্রে সজ্জিত। হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদে আছে তাঁত। একদিকে শান্তিপুরের মিহি ধুতি অন্যদিকে হুগলীতে ধনেখালির গামছা বাঙলার নাম রেখেছে। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়ার তসর বিখ্যাত। কিন্তু এ সব পড়ে কুটির-শিল্পের ভেতর। শক্তিচালিত যন্ত্র থেকে এদের জাত একেবারে ভিন্ন। কিন্তু ভিন্ন জাত হলে হবে কি,—বাংলার চারুশিল্পে লোকসংস্কৃতিতে পুষ্ট এই কুটির-শিল্প আবার অর্থনৈতিক জীবনে পয়মন্ত। তাই বাঙলার শিল্পোদ্যোগ যন্ত্র-শিল্প আর কুটির-শিল্পের যুগপৎ আশীর্বাদে ধন্য।

পথ-ঘাট

পথে কি শুধু দুখানা পা-ই হাঁটে? পায়ের চাঞ্চল্যে চোখ দুটিও হয়ে ওঠে চঞ্চল, চেনবার জানবার আগ্রহে মন ঝুঁকে পড়ে।

কত অজানাকে আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধে পথ, দূরকে করে নিকট, পর হয় ভাই।

পথ-ঘাটের যতই প্রসার হতে থাকবে ততই বেড়ে যাবে জীবনের সচলতা; ক্ষয়ে যাবে মনের রক্ষণশীলতা। তাই পথ-ঘাট, যানবাহন শুধুমাত্র শিল্প-বাণিজ্যের বাহন নয়; শুধুমাত্র সোনা-রুপোর ওজনের ভারবাহী নয়; মনের প্রসার ও উন্নতির ক্ষেত্রেও এর দান অসীম। এই পথ-ঘাট বুকে করে রেখেছে দীর্ঘলুপ্ত দিনের ইতিহাস। কত রাজাবাদশার আক্রমণ, বারো ভুঁইয়াদের প্রতিরোধ, ইংরেজের অকুণ্ঠ অত্যাচার, গ্রামগ্রামান্তের মানুষের প্রতিবাদ আর প্রতিরোধ—তার নীরব সাক্ষী এই পথ,—রাজপথ। আবার আধুনিক যুগে লক্ষ্মীর যাতায়াত এই পথে। আসানসোল-রানীগঞ্জের দ্রুত-পরিণত শিল্পাঞ্চল, এদিকে হুগলী অঞ্চলের ঘননিবদ্ধ কলকারখানা—এসব সম্ভব হয়েছে পথের জন্য। মাল নিয়ে যাওয়ার যদি কোনো সুযোগ সুবিধে না থাকে তবে কি করে গড়ে উঠতে পারে বাণিজ্যকেন্দ্র?

এই যাতায়াতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন নদী। একদিন বাঙলা নদীপথের গর্ব করতে পারত। সুদূর অতীত থেকে মধ্যযুগ অবধি নানা দেশে পণ্যের পশরা নিয়ে গেছে এদেশের সওদাগর। নিয়ে গেছে জ্ঞানের অমৃত। ভূমধ্যসাগর থেকে প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপগুলোতে এদের

যাতায়াত যে স্বাভাবিক ছিল—একথা সুবিদিত। বিদেশী পর্যটকের লেখা থেকে এদেশের পুঁথিপত্রে তার অঢেল প্রমাণ। কিন্তু সে রাম নেই, নেই সেই অযোধ্যা। নদী গতি বদলিয়েছে। একদা দুরন্ত অশান্ত আজ যেন প্রৌঢ় প্রবীণ, শান্ত সুবোধ। ঝিমিয়ে পড়েছে। উঠে গেছে বাণিজ্যের কেন্দ্র। গৌড়, তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রাম আজ অতীত কথা। আজকের পশ্চিম বাঙলার নদী সমস্যাসঙ্কুল। এ নদীগুলো সব জায়গায় সব সময় নাব্য নয়। ছোটোনাগপুরের উৎস থেকে যে সব নদী এসে পড়েছে বাঙলায়, যে-সব নদী আজো ভুলতে পারে নি পাহাড়ী খেয়াল—সে-সব নদী শুকিয়ে যায় গরমের সময়। মাঝখান দিয়ে সাপের মতো ঝিরঝিরে স্রোত, দুই পাড়ে বালির তপ্ত পাহাড়। এ পথে এ সময় নৌকো চলাচল করা সম্ভব হয় না। গঙ্গা বা হুগলী নদী অনেকখানি নাব্য। হিজলী জোয়ার খাল, উড়িষ্যা উপকূলের খাল, মেদিনীপুরের খাল, কলকাতার সারকুলার আর ইস্টার্ন খাল সব সময় নাব্য। ওদিকে মহানন্দা-তিস্তায় নৌকো যায় সব সময়। কোনো কোনো সময় স্টীমারও যায়। হুগলী নদীতে বড়ো বড়ো স্টীমার যায়। এখানে আসে যুদ্ধ-জাহাজ, বড়ো বড়ো বাণিজ্য-জাহাজ। চটকলের মাল স্টীমার বোঝাই হয়ে আসে কলকাতার বন্দরে। নোঙর-করা জাহাজ বোঝাই করা হয় এখান থেকে। এখান থেকেই তার বিদেশযাত্রা।

কলকাতার সার্কুলার খাল দিয়ে পৌঁছানো যাবে ভাঙরে। সেখান থেকে ভাঙর খাল দিয়ে ইচ্ছামতী ধরে হাসনাবাদ। হাসনাবাদ থেকে যাওয়া যাবে পূর্ব পাকিস্তানের খুলনায়। আর টালীর নালা ধরে বিদ্যাধরী ছুঁয়ে আসা যাবে ক্যানিংএ। সেখান থেকে বহু নদী পার হয়ে কালিন্দী, আর কালিন্দী থেকে খুলনা। ওদিকে পশ্চিম দিনাজ-

পুরে, এদিকে হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুরে যে সব খাল আছে, সেখান থেকে যাতায়াতের সুবিধা আছে। ওদের ভিতর উলুবেড়িয়া হাই-ক্যানাল, আত্রেয়ীধেপকা ক্যানাল, পুনর্ভবা তুলাই খাল বেশ নামকরা।

এক জেলা থেকে অন্য জেলাকে ভাগ করেছে কয়েকটা নদী। তাদের উপর দিয়ে পুল তুলে রাজপথ আর রেলপথ তৈরী হয়েছে। হাওড়া-কলকাতার মাঝখানে হুগলী নদীর উপর হাওড়া ব্রীজ। এদিকে হাওড়া স্টেশন ওদিকে শিয়ালদা—মাঝখানে দুই থামের উপর পুল। ট্রাম, বাস, মোটর, ট্রাক, রিক্‌শা অষ্টপ্রহর যাচ্ছে; জীবনের গতিকে অব্যাহত রেখেছে এই পুল। হুগলী নদীর ওদিকে উইলিংডন ব্রীজ বালি আর দক্ষিণেশ্বরকে বেঁধেছে। একপাশে তার রেলপথ অন্যপাশে মোটরের রাস্তা, হাঁটার রাস্তা। গরিফা আর হুগলীকে গেঁথেছে জুবিলি ব্রীজ; রেলপথ পাতা তার উপর। হাওড়া আর মেদিনীপুরের মাঝখানে বিস্তীর্ণ রূপনারায়ণ—মাঝখানে কোলাঘাট ব্রীজ। রেল চলছে তার উপর দিয়ে।

এক রাজ্য থেকে আর-এক রাজ্যে চলে গেছে ট্রাঙ্ক রোড। এদের বলে ন্যাশনাল হাইওয়েজ। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড হুগলী নদীর বাঁ দিক দিয়ে কাঁচড়াপাড়া হয়ে চলে গেছে হরিণঘাটা। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড কলকাতা থেকে গিয়েছে পাঞ্জাবে। উড়িষ্যা রোড হাওড়া থেকে মেদিনীপুরের ভিতর দিয়ে উড়িষ্যা; সেখান থেকে মাদ্রাজ। যশোর রোড চলে গেছে পূর্ব পাকিস্তানে। কলকাতা-কৃষ্ণনগর রোড বারাসত থেকে আমডাঙা হয়ে রানাঘাট; আবার রানাঘাট থেকে শান্তিপুর হয়ে কৃষ্ণনগর চলে গেছে। কৃষ্ণনগর থেকে ওই পথ মুর্শিদাবাদ-লালগোলা হয়ে চলে গেছে আরো উত্তরে। উড়িষ্যা-

মেদিনীপুর রোডের এক অংশ বাঁকুড়া হয়ে বিহার-উড়িষ্যাকে যোগ করেছে। নেপাল সীমান্ত রোড মেচি নদী ধরে গিয়েছে উত্তর থেকে দক্ষিণে আর সিকিম রোড শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পং হয়ে গ্যাঙটকে।

এ ছাড়া প্রত্যেক জেলায় আছে বিশিষ্ট রাজপথ। সে পথগুলো জেলার মানুষের বিশেষ প্রকৃতির স্মৃতিচিহ্ন যেন। পাহাড়ী অঞ্চলে বা যেখানকার মাটি কঠিন, ধাতুমিশ্রিত, সেখানে পথ তৈরি করা অনেক সহজসাধ্য। সে-সব পথের দৃশ্যপটও অতি মনোরম। দার্জিলিঙের ঘুমের সীমানা রোড অদ্ভুত গতিতে চলে গেছে নেপালের দিকে। এই পাকা রাস্তা ছাড়া আছে কাঁচা রাস্তা। শহরতলী অঞ্চলে আরো একরকমের রাস্তা আছে—যা কাঁচাও নয় পাকাও নয়। তা ছাড়া গ্রাম্যপথ বা মেঠো পথের তো কথাই নেই। এ রাস্তা কুলিমজুর লোকলস্কর বানায় নি। মানুষ তার নিজের তাগিদে পায়ে হেঁটে এ পথ সৃষ্টি করেছে। এর নেই মেরামতের খরচ, নেই মাইনে-পাওয়া ইঞ্জিনিয়ারের যত্ন। ১৯৪৭ সালে এই গ্রাম্য পথের হিসেব ছিল ১৩০০০ মাইল। সম্প্রতি আরো কয়েক শত মাইল বেড়ে গেছে। রাজপথের দৈর্ঘ্য ছিল ২৪৬২ মাইল।

ভারতবর্ষের ভিতর বাঙলার রেলপথ বেশ উন্নত, এবং গুরুত্বপূর্ণ। শিয়ালদা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে সংযোগ। হাওড়া দিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে এর যোগসূত্র। আগে এই রেলপথ বেঙ্গল-নাগপুর, ইস্ট ইণ্ডিয়ান নামে পরিচিত ছিল। এখন এদের অন্য নাম হয়েছে। ভারতবর্ষের সমস্ত রেলপথকে এখন কয়েকটা অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। পশ্চিম বাঙলার অঞ্চলটা পড়েছে পূর্ব, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের ভিতর। এ সব ব্রডগেজ লাইন। ব্রডগেজ ছাড়া লাইট গেজ এবং মিটার গেজ রেলপথও আছে।

কলকাতার শহরতলী আর বর্ধমান-বাঁকুড়ায় লাইট গেজ, আর মালদহে পশ্চিম দিনাজপুরে মিটার গেজ রেলপথ। বেলগাছিয়া থেকে হাসনাবাদ অবধি ছিল লাইট গেজ রেলপথ। কিন্তু বর্তমানে এ লাইন উঠে গেছে। সরকারী চেষ্টায় এ পথে ব্রডগেজ লাইন স্থাপনের চেষ্টা চলছে। হাওড়া জেলায় আমতা-সিয়াখালা রেলপথও লাইট গেজের। নদীয়ার নবদ্বীপঘাট থেকে শান্তিপুর অবধি এই ছোটো লাইন। বর্ধমান-বাঁকুড়ার গ্রামাঞ্চলে ছোটো লাইন। পশ্চিম বাঙলায় বর্ধমানই রেলপথে সবচেয়ে উন্নত। এর চারপাশে হাজার শিকড়ের মতো রেলপথ। শিল্পাঞ্চল বলেই এত রেলপথ পাতা সম্ভব হয়েছে এবং আজো টিকে আছে। মালদহ-দিনাজপুরে মিটার গেজ, কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে আবার লাইট গেজ রেলপথ। ব্রডগেজ আর মিটার গেজ মিশিয়ে একটা পথ পশ্চিম বাঙলার গৌরব হয়ে আছে। এর নাম আসাম বেঙ্গল লিঙ্ক। দেশভাগের পর বিচ্ছিন্ন অংশের সঙ্গে এই হল যোগসূত্র, আসামের মুক্তিপথ। শিয়ালদা থেকে ছেড়ে ক্যালকাটা কর্ডে দক্ষিণেশ্বরের উইলিংডন ব্রিজ পার হয়ে ধরতে হবে হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইন। তারপর বর্ধমান। বর্ধমান থেকে মেন লাইনে খানা জংশন। সেখান থেকে সাঁইথিয়া লুপ ধরে সকরি-গলি ঘাট। এর পর গঙ্গা। থামবে গাড়ি। গঙ্গার উপর দিয়ে ব্রিজ নেই। পার হতে হবে গঙ্গা, যেতে হবে অন্য পার—মণিহারী ঘাট। তারপর আগের ও টি রেলপথ ধরে কাটিহার, কিষেনগঞ্জ। ন্যারো গেজে যেতে হবে শিলিগুড়ি নর্থ। সেখান থেকে তিস্তার নতুন পুল পার হয়ে বাগরাকোট। সেখান থেকে গতির অদল বদল করে আলীপুর ডুয়ার্স থেকে আসামের ফকিরাগ্রাম। শিলিগুড়ি নর্থ থেকে ফকিরাগ্রাম অবধি আগে একটানা রেলপথ ছিল না।

পাহাড় আর অসংখ্য বুনো নদী ছিল প্রথম ও প্রধান অন্তরায়। এখন পুল বেঁধে বেঁধে বসানো হয়েছে রেলের পাটি। কিষেনগঞ্জ থেকে ফকিরাগ্রাম অবধি ১৪২ মাইল রেলপথ তৈরী করতে হয়েছে নতুন করে। তারপর এই পথ ফকিরাগ্রাম থেকে গিয়েছে আমিনগাঁও। এই পথে একটানা যাত্রা নেই, ওঠানামা করতে হবে। এ ছাড়া হাওড়া দিয়ে বোম্বে দিল্লী নাগপুর পুরী মাদ্রাজের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ-সংযোগ।

গত যুদ্ধের পর বিমানপথে যোগাযোগের পথ অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে গেছে। সামরিক প্রয়োজনে বাঙলার নানান জায়গায় বিমান-ঘাঁটি তৈরী করতে হয়েছিল; তাকে বাঁচানোর জন্য তাই চারপাশে হয়েছে পিচের পরিষ্কার রাস্তা। যুদ্ধের পর এত বিমান-ঘাঁটির দরকার লাগল না, উঠে গেল ঘাঁটিগুলো, কিন্তু পড়ে থাকল পথ। এই ভাবে উপকার পেয়েছে মেদিনীপুর। যা হোক, এখন পশ্চিম বাঙলায় চারটে বিমান-ঘাঁটি। দমদম, বারাকপুর, বালুরঘাট, বাগডোগরা। এর মধ্যে দমদম ঘাঁটি সবচেয়ে নামকরা, আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ—পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিমান-ঘাঁটি বলেন কেউ কেউ। যাত্রীবাহী বিমানের ওঠানামার সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে বলেই দমদম থেকে মালবাহী কোনো বিমান যায় না। বারাকপুর থেকে মালবাহী বিমান যাত্রা শুরু করে, বা ওঠানামা করে। বালুরঘাট বিমানঘাঁটি যতটা না বাণিজ্যের প্রয়োজনে তার চেয়ে অনেক বেশী সামরিক প্রয়োজনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বিভক্ত পশ্চিম বাঙলাকে উপযুক্ত ভাবে সামরিক শাসনে বেঁধে রাখার জন্যই বালুরঘাট।

বাগডোগরা বিমানঘাঁটি দার্জিলিঙে। বাগডোগরা থেকে মোটরে করে যেতে হয় দার্জিলিং শহরে। এখান থেকে যেমন মালবাহী বিমান যাত্রা করে, তেমনি ওঠানামা করে যাত্রীবাহী বিমান।

জেলার কথা

•

•

প্রেসিডেন্সি বিভাগ
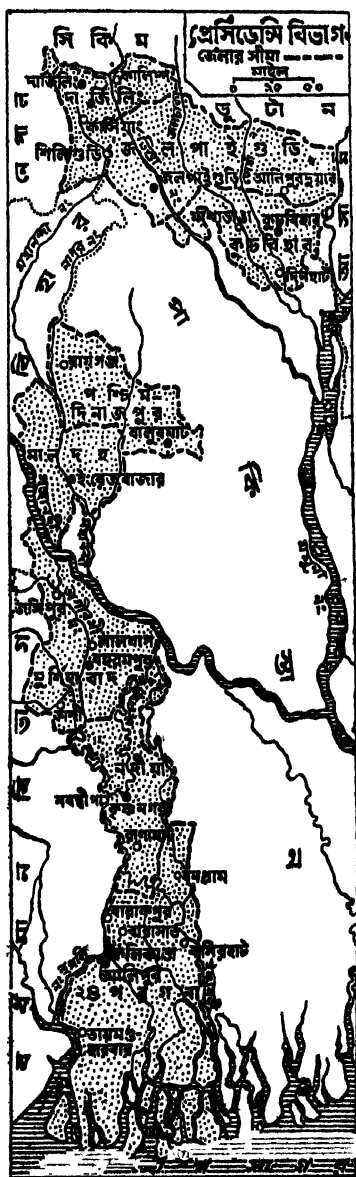
২৪ পরগনা

সমুদ্রশায়ী চব্বিশ পরগনার অস্তিত্ব বহুদিনের। রামায়ণ-মহাভারতে গঙ্গাসাগরের উল্লেখ আছে। সে গঙ্গাসাগর জলজঙ্গলের দেশ সুন্দরবন। পরবর্তী কালে বিপ্রদাসের চণ্ডীমঙ্গলে আর আইন-ই-আকবরীতে ২৪ পরগনার উল্লেখ পাওয়া যায়। মোগল যুগের শেষে বাঙলায় যখন বিভিন্ন ইউরোপীয় শক্তির স্বার্থসংঘাত চলছে তখন ইতিহাসের মঞ্চে বার বার ২৪ পরগনার আবির্ভাব দেখা যায়। বিদেশী বণিকদের মধ্যে পোর্তুগীজরাই প্রথম ২৪ পরগনায় ঘাঁটি গেড়েছিল—আদিগঙ্গা যেখানে বিদ্যাধরীতে মিশেছে তারই পাশের এক গ্রামে। তাদের পিছু-পিছু এল ওলন্দাজ বণিকেরা—কারখানা খুলল বরানগরে। ফলতায় বসল তাদের জাহাজ-সারাই কারখানা।

এদিকে ইংরেজের সঙ্গে নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরোধ তখন চরমে উঠেছে। নবাবের সৈন্য এসে তাঁবু ফেলল মানিকচাঁদের বাগানে—এখন সেটা হালসিবাগান। তারও পরে নবাবের সঙ্গে ইংরেজের বহুতর সংঘর্ষ হয়েছে—তার ক্ষতচিহ্ন ২৪ পরগনার অঙ্গে ছড়ানো।

তারপর কোম্পানির ইতিহাস, সাম্রাজ্য পত্তনের ইতিহাস। আর বাঙালীর গণপ্রতিরোধের ইতিহাস। তারও গৌরব সগর্বে ধারণ করছে ২৪ পরগনা। সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম গর্জন উঠেছিল ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরে। তিতুমীরের ওয়াহবী আন্দোলন—তার কেন্দ্র ছিল ২৪ পরগনার বারাসত মহকুমা। পরাস্ত হয়েও সে বিদ্রোহ মৃত্যুপণ প্রতিরোধের গৌরবে উজ্জ্বল।

২৪ পরগণা জেলা
সীমানা
জেলা
মহকুমা
থানা
সদর মহকুমা
মহকুমা
থানা
রেলপথ
পাকা রাস্তা
স্কেল
০
৮
১৬ মাইল
নদীয়া
যশোহর
হুগলী
হাওড়া
খুলনা
মেদিনীপুর
বনগ্রাম
বীজপুর
কাঁচড়াপাড়া
নৈহাটি
ভাটপাড়া
নোয়াপাড়া
জগদ্দল
আমডাঙ্গা
বসিরহাট
টিটাগড়
ব্যারাকপুর
বারাসাত
দেগঙ্গা
বরাহনগর
দমদম
কলিকাতা
মেটিয়াবুরুজ
হাড়োয়া
টাকী
হাসনাবাদ
বজবজ
বেহালা
সোনারপুর
ভাঙ্গড়
হিঙ্গলগঞ্জ
বিষ্ণুপুর
বারুইপুর
ক্যানিং
সন্দেশখালি
ফলতা
মগরাহাট
ডায়মণ্ডহারবার
জয়নগর
কুলপি
কাকদ্বীপ
গোসাবা
সাগর দ্বীপ
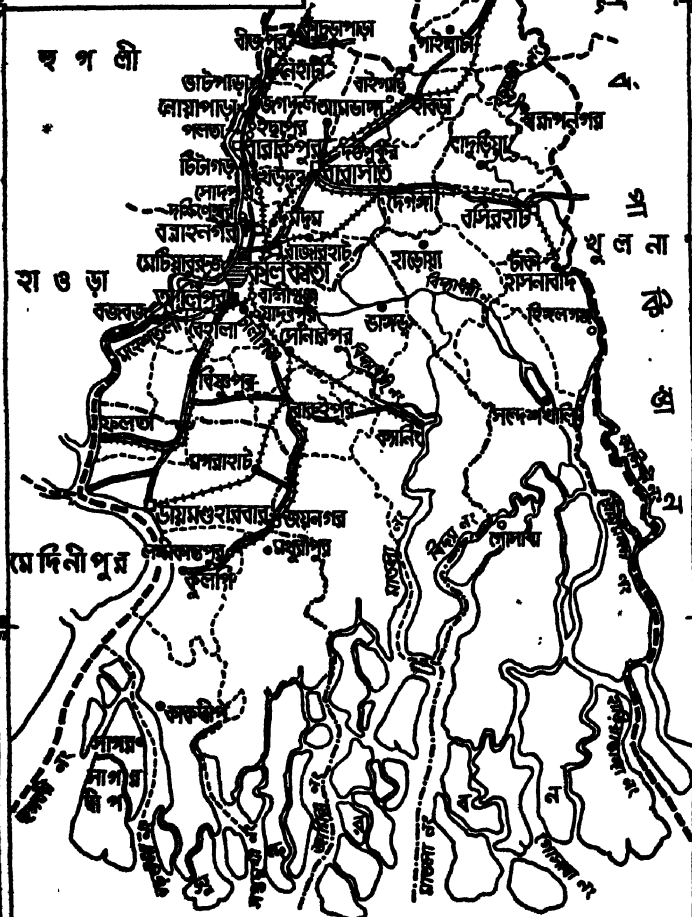
উত্তরে নদীয়া আর যশোহর জেলা, পূর্বে খুলনা, দক্ষিণে বঙ্গোপ-সাগর, পশ্চিমে হুগলী—এই হল ২৪ পরগনার চতুঃসীমা। আয়তন ৪,০১৬ বর্গমাইল। মহকুমা ৬টি—আলিপুর, ব্যারাকপুর, বারাসত, বসিরহাট, ডায়মণ্ডহারবার, বনগ্রাম। মোট লোকসংখ্যা : ৪৬,০৯,৩০৯

মহকুমা হিসেবে লোকসংখ্যা :

মহকুমা	মোট	পুরুষ	নারী
আলিপুর	১৫,১৩,৯৪৮	৮,১২,২৫২	৭,০১,৬৯৬
ব্যারাকেপুর	৮,৭৭,৯০০	৫,৩৬,০৩৬	৩,৪১,৮৪০
বারাসত	৩,৯৩,৯৮০	২,০৬,২৬৮	১,৮৭,৭১২
বসিরহাট	৭,১৩,৬১৯	৩,৭২,১০৭	৩,৪১,৫১২
ডায়মণ্ডহারবার	৯,০১,১২০	৪,৬৪,৪০৯	৪,৩৬,৭১১
বনগ্রাম	২,০৮,৭৪২	১,০৮,৫৬৪	১,০০,১৭৮

প্রাকৃতিক গঠনের দিক দিয়ে ২৪ পরগনাকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। উত্তর দিকের জমি দক্ষিণ দিকের চেয়ে উঁচু। উত্তরাংশ যেন পরিণত, কিন্তু দক্ষিণাংশে সুন্দরবন অঞ্চলে মাটির ভাঙাগড়া যেন আজও শেষ হয় নি। শিল্পাঞ্চল উত্তর দিকেই—বজবজ থেকে শুরু করে বীজপুর অবধি।

প্রধান নদী হুগলী। তা ছাড়া আছে বিদ্যাধরী। সুন্দরবন থেকে যাত্রা শুরু করে হাড়োয়ার কাছে পশ্চিম দিকে বাঁক নিতেই এসে পড়ল নোনা খাল। তারপর দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে বেলেঘাটা আর আদিগঙ্গার জল নিয়ে ক্যানিংএর কাছে এসে পড়ল মাতলায়। এই মাতলায় এসে মিশেছে করতোয়া। পিয়ালীও বিদ্যাধরী থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে গিয়ে পড়েছে মাতলায়। ওদিকে নদীয়া থেকে

বেরিয়েছে ইচ্ছামতী—২৪ পরগনার সীমান্ত-নদী। দীর্ঘ পথ ঘুরে এ নদী চলে গেছে খুলনার সুন্দরবনের দিকে। সুন্দরবনে অজস্র নদী-নালা—সহস্রমুখী ভূমিভাগ।

২৪ পরগনায় ১৬২৯'৪ বর্গমাইল সংরক্ষিত বনভূমি। ১৬,৩৪,৭০০ একর জমি চাষ করা হয়। তার ভিতর ধানের চাষ হয় ১২,৯৭,৩০০ একর জমিতে। তা ছাড়া হয় পাট—মোট আবাদী জমির দশ ভাগের এক ভাগে পাটের চাষ হয়। এ জেলার ৩৫,২৮৩ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা আছে।

এই জেলায় রাস্তার দৈর্ঘ্য হল ২১৪৬'৪ মাইল—পাকা রাস্তা ১০৭৬'৩ মাইল, কাঁচা রাস্তা ১০৭০'১ মাইল। ইস্টার্ন রেলপথের শিয়ালদা স্টেশন থেকে এই জেলা কলকাতার সঙ্গে ঘরের সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। তা ছাড়া আছে কালীঘাট-ফলতা রেলপথ।

২৪ পরগনার সব নদীই নাব্য। আদিগঙ্গা, বেলেঘাটার খাল, ভাঙড় খাল, কৃষ্ণপুর খাল দিয়ে জেলার ভিতরের যাতায়াত আর বাণিজ্যের সুবিধা হয়েছে।

মহকুমা শহরগুলো বাদ দিলে এ জেলার প্রসিদ্ধ স্থানের ভিতর পড়ে : ইছাপুর—বন্দুকের কারখানা। বারুইপুর—অতীতে নীলের চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল। ভাটপাড়া—সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র ছিল। কাঁকিনাড়া আর জগদ্দল—২৪ পরগনার বিখ্যাত শিল্পাঞ্চল। বজবজ—শিল্পপ্রধান এলাকা। এখানে মুসলমান আমলের ভগ্নশেষ দুর্গ আজও দেখা যায়। মাতলা নদীর উপর ক্যানিং শহর। এখানে একটি পোর্ট তৈরী হয়েছিল—তার পাঁচটি জেটি ছিল, ট্রাম বসানো হয়েছিল। বিরাট চালকল ছিল এ শহরে। আজ সে সব গেছে।

প্রসিদ্ধ বিমান-বন্দর হল দমদম। ১৭৫৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি

নবাবের সঙ্গে ক্লাইভের সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল দমদমে। অষ্টাদশ শতকে দমদম ছিল গোরাদের বিলাসভূমি। তারপর আস্তে আস্তে তৈরী হতে লাগল দমদম ক্যান্টনমেণ্ট। ঐতিহাসিক স্মৃতি ছাড়াও ফলতায় আছে জলের পাম্পিং স্টেশন। আঠারো শতকে গার্ডেন-রীচে মোগলদের আলিগড় নামে এক দুর্গ ছিল। ক্লাইভ সেই দুর্গ জয় করে নেয়। তারপর ওখানে কোম্পানির সাহেবদের ঘরবাড়ি গড়ে ওঠে। কিন্তু বেশীদিন থাকতে পারল না সাহেবরা। অযোধ্যার নবাব এসে যেই মেটিয়াবুরুজে বাস করতে আরম্ভ করলেন অমনি সাহেব আর বণিকরা উঠে আসতে শুরু করল। সেই সব বড়ো বড়ো বাড়িগুলোয় হয় বসেছে কোনো কারখানা নয় তো কোনো কোম্পানির অফিস। রামপ্রসাদের জন্মস্থান হালিশহর। প্রসিদ্ধ সাগরদ্বীপে মকর সংক্রান্তির মেলা বসে।

রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আর বিদ্রোহের পটভূমি যদি নদীয়ার থাকে, থাক। সে পরিচয় নিয়ে নদীয়া বাঙলার মানুষের কাছে মাথা উঁচু করে নেই। নদীয়া গর্ব করে তার বিদ্যার, পাণ্ডিত্যের। দীর্ঘ-কালের অক্লান্ত সাধনায় ন্যায়ের জটিল সূত্র সমাধানের আর স্মৃতির প্রখর জ্ঞানের গরিমা অর্জন করেছিল নদীয়া। ইংরেজ আমলেও কোম্পানির কর্মচারীরা নদীয়াকে বর্ণনা করেছে বাঙলার অক্‌সফোর্ড বলে।

১০৬৩ সালে গৌড়রাজ লক্ষ্মণসেন প্রতিষ্ঠা করলেন নদীয়া। গৌড় তো মহানন্দার ধারে, পতিতপাবনী গঙ্গার দেখা পাওয়া যাবে কোথায়? সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে লক্ষ্মণসেনের। নদীয়ার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ভাগীরথী। ভাগীরথীর পুবে জলাঙ্গীর পশ্চিমে প্রাসাদ উঠল লক্ষ্মণসেনের। আগে বল্লাল দীঘির গা দিয়ে বয়ে যেত ভাগীরথী। কালক্রমে গতি পরিবর্তন করল ভাগীরথী। এখন সে স্রোতোরেখা একটা খাল হয়ে গেছে। যে ভাগীরথী একদিন নদীয়াকে মাঝামাঝি দুই ভাগে ভাগ করেছিল, সে ভাগীরথী সরে এসেছে। নতুন চর উঠেছে, বসেছে নতুন পত্তনি। ১২০৩ সাল অবধি নদীয়া ছিল হিন্দু রাজবংশের রাজধানী। সে সালেই এলেন বক্তিয়ার খিলজি। বিহার থেকে সোজা নদীয়ায়। নদীয়ার আশেপাশে তখন গহীন জঙ্গল। বক্তিয়ার তাঁর সব সৈন্য সেই জঙ্গলের ভিতর লুকিয়ে রাখলেন। শুধু আঠারো জন অশ্বারোহী

নিয়ে এগিয়ে গেলেন প্রাসাদের দিকে। প্রহরী পথ আটকাল। চতুর বক্তিয়ার বললেন যে তিনি দিল্লীশ্বরের কাছ থেকে আসছেন। প্রহরী পথ দিল। প্রাসাদে ঢুকে নিজ মূর্তি ধরলেন বক্তিয়ার, সংকেত দিলেন তাঁর সৈন্যদের। হত্যালীলা শুরু হল প্রাসাদে। রাজা ডিঙি করে পালালেন। তারপর বক্তিয়ার চললেন গৌড়ে।

কালক্রমে প্রতিষ্ঠা হল নদীয়া রাজবংশের। কনৌজ থেকে আনা পাঁচজন ব্রাহ্মণের ভিতর একজন ভট্টনারায়ণ। নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা তিনিই। কিন্তু সেই বংশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন নদীয়ার ২১তম রাজা দুর্গাদাস বা মজুমদার বাহাদুর। তখন বাঙলাদেশে বারো ভুঁইয়ার যুগ। দিল্লীশ্বর নামেমাত্র সম্রাট। প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে বিবাদ বাধল কচু রায়ের। কচু রায়ের ধারণা ছিল, যশোরের সিংহাসন তাঁরই প্রাপ্য। কচু রায় গেলেন দিল্লীতে। দিল্লীর মসনদ ইতিমধ্যে বাঙলার উপর বিরূপ। সম্রাট পাঠালেন মানসিংহকে। চাকদহ অবধি নৌকো করে এল মোগল সৈন্য। খবর পেয়ে আশপাশের সব রাজারাই গেলেন পালিয়ে। কিন্তু থাকলেন শুধু মজুমদার বাহাদুর। অভ্যর্থনা করলেন মানসিংহকে। খুব খুশী মানসিংহ। নদীর এপারে এসে পথ দেখালেন মজুমদার বাহাদুর। প্ল্যান তৈরি করে দিলেন। মানসিংহ বললেন,—মনে রাখবেন। কিছু দূর যেতে না যেতে ঝড়বাদল। রসদ ফুরিয়ে গেছে। পিছপা নন মজুমদার বাহাদুর। নিজের গোলা থেকে ধান-চাল এনে খাওয়ালেন মোগল সৈন্যদের। মানসিংহ বললেন—ভুলবেন না। ভোলেন নি মানসিংহ। প্রতাপাদিত্যকে পিঞ্জরাবদ্ধ করে যখন ফিরলেন মানসিংহ তখন জাহাঙ্গীর সম্রাট। সঙ্গে নিলেন মজুমদার বাহাদুরকে। প্রীত হলেন জাহাঙ্গীর, তাঁকে উপাধি দিলেন 'মহারাজা'।

এই বংশের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাঙলার মধ্যযুগে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন। ভারতচন্দ্র তাঁরই সভাকবি। সে সময় বাঙলার অবস্থা বড়োই খারাপ। আলিবর্দির সময় সুদিন ফিরল, কিন্তু থাকল না। ঘনিয়ে এল পলাশীর যুদ্ধ। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কিন্তু সাহায্য করলেন ইংরেজকে। ক্লাইভ তাঁকে উপাধি দিলেন রাজেন্দ্র বাহাদুর আর পলাশীতে ব্যবহৃত বারোটা কামান। রাজবাড়িতে আজো সেই কামানগুলোকে দেখা যায়।

নদীয়া রাজবংশের স্বর্ণযুগ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রে শেষ হলেও শেষ হয় নি নদীয়ার মানুষের কথা। দেখতে দেখতে নীল চাষ ছড়িয়ে পড়ল। লাভের সঙ্গে লোভ, আর লোভের সঙ্গে অত্যাচার। নীলকুঠির কুঠিয়াল একদিকে আর একদিকে বাঙলার লাঠিয়াল। ১৮৬০ সাল। আগুন জ্বলল গ্রামে গ্রামে। শড়কি আর বর্শা নিয়ে দাঁড়াল মানুষ। একের পর এক পুড়তে লাগল নীল কুঠি। নদীয়া আর পাশের পরগনা থেকে পাততাড়ি গোটাল নীল সাহেব। তার পরের ইতিহাস সমস্ত বাঙলার।

সেই নদীয়া এসেছে ইংরেজের শাসনে। তখন তার আয়তন ছিল ২,৮০০ বর্গমাইল। মুক্তির দক্ষিণা দিতে হয়েছে ১৯৪৯এ। স্বাধীন ভারতবর্ষে নদীয়ার আয়তন হল ১,৫২৭ বর্গমাইল। জেলার ছুটো মহকুমা—সদর বা কৃষ্ণনগর আর রানাঘাট। নদীয়ার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ, উত্তর-পূর্বে রয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের কুষ্টিয়া জেলা। পশ্চিমে ভাগীরথী—কেবল খণ্ডভূমি ছাড়া। সেই ভূমিখণ্ডে নবদ্বীপ শহর। দক্ষিণ আর দক্ষিণ-পুবে ২৪ পরগনা। ১১,৪৪,৯২৪ জন মানুষ বাস করে নদীয়ায়। মহকুমা হিসেবে তার হিসাব হল—

মহকুমা	মোট	পুরুষ	নারী
কৃষ্ণনগর	৭,০২,৮৭১	৩,৬০,৫৭৮	৩,৪২,২৯৩
রানাঘাট	৪,৪২,০৫৩	২,৩০,৩৫৮	২,১১,৬৯৫

সমতল পলি-অঞ্চল নদীয়া। সবটাই হালকা বেলে দোঁ-আশ মাটির দেশ। ভিজে-ভিজে ভাবটা তাই বেশীক্ষণ থাকে না, উর্বরতাও খুব বেশী নয়। কিন্তু মুর্শিদাবাদ থেকে নেমে এসেছে কালান্তর অঞ্চল। ভাগীরথী আর জলাঙ্গীর মাঝখানে পনেরো মাইল দীর্ঘ আর আট মাইল প্রশস্ত নিম্নভূমির নাম কালান্তর। উপরের দিকে শক্ত কালো মাটি। আমন ধান ভালো হয়। শরৎকালে জলে ডোবা থাকে বলে ধান হতে পারে না। শীতকালেও শস্য হয় না। ভাগীরথীর বন্যায় ডুবে যাবার সমূহ আশঙ্কা আছে এ অঞ্চলের।

এ জেলায় বহু হাজা-মজা খাল আর জলা-জমি। মারী-মড়কের পীঠস্থান বলে মাঝখানে বসতির হার খুব কমে গিয়েছিল। আর এই মহামারী ম্যালেরিয়ার কারণ এই নদীগুলো। 'নদীয়া নদী' বৈজ্ঞানিকদের কাছে সমস্যা। নদীয়া নদী বলতে বোঝায় ভাগীরথী, জলাঙ্গী আর মাথাভাঙা। পলাশীর কাছ থেকে ভাগীরথী এসে পড়েছে নদীয়ায়—তারপর সে পশ্চিম দিকের সীমানা তৈরী করেছে। জলাঙ্গী ভাগীরথীতে এসে পড়েছে নবদ্বীপের উলটো দিকে। ভাগীরথী-জলাঙ্গীর মিলনকেন্দ্র থেকে নামবদল হয়েছে ভাগীরথীর—সাহেবী নাম তার হুগলী। পদ্মা থেকে বেরিয়ে এসেছে জলাঙ্গী। উত্তর-পশ্চিম সীমানা-রেখা হয়ে বেশ কিছুদূর এসে নেমে পড়েছে এই জেলায়। তারপর দক্ষিণমুখী হয়ে এল কৃষ্ণনগরে। সেখান থেকে পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়ে মিলল ভাগীরথী। যেখান থেকে জলাঙ্গী পদ্মার মায়া কাটাল, তার আরো দশ মাইল দক্ষিণ থেকে

নামল মাথাভাঙা। তারপর দক্ষিণ-পুব দিক থেকে বয়ে এল হাট বোয়ালিয়া অবধি। সেখান থেকে ভাগ হয়ে গেল মাথাভাঙা। একটা ভাগের নাম হল কুমার। সে চলে গেল যশোরের দিকে। অন্যশাখা দক্ষিণমুখী গতি রেখে আরো কিছুদূর এল। এও আবার ভাগ হয়ে গেল—একটার নাম হল চূর্নী, অন্যটার নাম ইচ্ছামতী। শান্তিপুর আর চাকদহের মাঝখানে চূর্নী রানাঘাটকে পিছনে রেখে মিশল ভাগীরথীতে। আর ইচ্ছামতী এ জেলার সীমানা নির্দেশ করে বনগ্রামের কাছে এল ২৪ পরগনায়। শীর্ণক্ষীণ নদীয়া নদীর সমস্যা বহুদিনের। ১৮১৩ সাল থেকে সংস্কারের নানা রকম চেষ্টা চলেছে। কখনো সুফল পাওয়া গিয়েছে, কখনো যায় নি। সর্বশেষ পরিকল্পনা হয়েছে গঙ্গায় বাঁধ বাঁধার। উদ্দেশ্য ছিল ভাগীরথীকে সারা বছরের জন্য নাব্য রাখা আর শাখানদীতে জল সরবরাহ করা। এতে জল নিকাশের কাজ যেমন হবে, তেমনি হবে বাণিজ্যের সুবিধা। কিন্তু সে পরিকল্পনা এখনো কাজে পরিণত হয় নি।
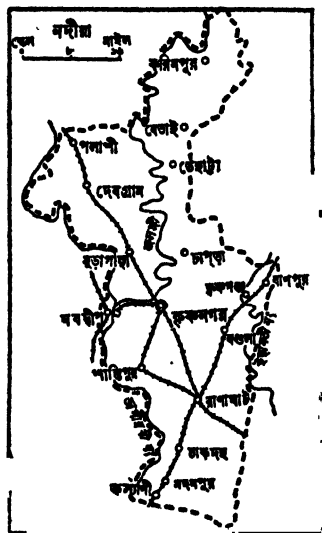
জেলার বৃষ্টিপাত গড়ে ৫০″। আবাদী জমির পরিমাণ ৬,৭০,৩০০ একর। জমি সমতল বলে জল সেচের বড় অসুবিধা। সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় ৭,৮৯৯ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা,

আছে। ধানই এখানকার প্রধান চাষ। ৪,৪৯,০০০ একর জমিতে ধান চাষ হয়। একর-প্রতি ফলন গড়ে আট মন। এ জেলায় পাট চাষ ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ছে। আবাদী জমির প্রায় শতকরা ২৫ ভাগে আজকাল পাট চাষ হচ্ছে। ফলে আউশ ধানের জমি ক্রমশই কমছে। অবশ্য পাটের ফলন এখানে ভালো হয়। কৃষ্ণনগরে পাট চাষ উন্নতির জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে।

ফ্যাক্টরি আইনের ভিতর পড়ে এমন শিল্প নদীয়ায় খুব সামান্য। বড়ো শিল্প হচ্ছে চিনির কারখানা। পলাশীর ধারে রামনগরে এর কারখানা। রানাঘাট আর কৃষ্ণনগরে আছে কয়েকটা করে তেলের কল। কিন্তু নদীয়ার গৌরব কুটির-শিল্পে। শান্তিপুরের সমৃদ্ধি অনেক দিনের। ১৮ শতকের শেষ ভাগ থেকে ১৯ শতকের গোড়ার দিক অবধি শান্তিপুরের তাঁতের কাপড়ের ছিল দেশজোড়া নাম। কোম্পানি প্রচুর কাপড় সওদা করত এখান থেকে। কিন্তু ১৮১৩ সাল থেকে শান্তিপুরের তাঁত শিল্প আঘাত পেতে আরম্ভ করেছে। ১৮২৫ সালে যখন কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা হল, তখন আর সামলাতে পারল না শান্তিপুর। এখন কোনো রকমে টিকে আছে মাত্র। কৃষ্ণনগরের মাটির কাজ নদীয়ার আর-একটা প্রসিদ্ধ সম্পদ।

পাকিস্তানের সীমান্ত বলেই নদীয়ায় রাস্তার উন্নতি হয়েছে। শান্তিপুর থেকে নবদ্বীপ অবধি আছে ছোটো রেল লাইন। কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর অবধি যে রাস্তাটা চলে গেছে তা শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট আর পলাশী হয়ে গেছে। তা ছাড়া আছে বগুলা-কৃষ্ণনগর রোড, রানাঘাট-কৃষ্ণনগর রোড, চাকদা-ঝিকরগাছা রোড—(যশোহর)। এ ছাড়া নৌকা চলাচল করে নদীগুলোয়।

মহকুমা শহর দুটো বাদ দিলে এখানে অনেক তীর্থস্থান আছে : মেলাও বসে। শ্রীচৈতন্যদেবের কীর্তিভূমি নবদ্বীপ। চুর্নীর ধারে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শিব-নিবাস। বীরনগরের ইতিহাস পুরানো। ভাগীরথী তখন বীরনগরের ভিতর দিয়ে যেত। চাকদহ বহু প্রাচীন। লোকে বলে ভগীরথ যখন গঙ্গা আনছিলেন তখন এখানে তাঁর রথের চাকা বসে গিয়ে দহ সৃষ্টি হয়। তাই নাম হয়েছে চাকদহ। কল্যাণীতে সরকারী প্রচেষ্টার স্বাক্ষর। ঘোষপাড়ার মেলা বিখ্যাত।

মুর্শিদাবাদ

বাঙলার স্বাধীনতার সূর্যাস্ত মুর্শিদাবাদে—পলাশীর প্রান্তরে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানির ভার নিল, তখন মুর্শিদাবাদ ছিল অনেক বড়ো। তারপর বহু অদল-বদল হয়ে গেছে। শেষ পরিবর্তন হয়েছে ১৯৪৭ সালে—বাঙলা ভাগের সময়। এখন যে মুর্শিদাবাদ আমরা দেখি তার উত্তরে গঙ্গা বা পদ্মা, পূর্বে নদীয়া জেলা এবং পূর্ব পাকিস্তান, দক্ষিণে নদীয়া ও বর্ধমান, পশ্চিমে বীরভূম ও সাঁওতাল পরগনা। এর আয়তন হল ২০৯৫ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ১৭,১৫,৭৫৯। চারটি মহকুমা—সদর বা বহরমপুর, লালবাগ, জঙ্গীপুর আর কান্দী।

মহকুমা	মোট	পুরুষ	নারী
সদর	৫,৪৪,২২৮	২,৮০,০০৬	২,৬৪,২২২
লালবাগ	৩,৯৩,৮৭১	১,৯৮,৫৫৯	১,৯৫,৩১২
জঙ্গীপুর	৪,৩১,৯৭৯	২,১৫,৪০৯	২,১৬,৫৭০
কান্দী	৩,৪৫,৬৮১	১,৭৫,৪৮৪	১,৭০,১৯৭

মুর্শিদাবাদের উত্তর প্রান্ত-সীমায় গঙ্গা বা পদ্মা। তারপর মালদহ আর রাজশাহী থেকে মুর্শিদাবাদকে বিচ্ছিন্ন করে এগিয়ে গেছে। নূরপুর থেকে ভাগীরথী গঙ্গা থেকে বেরিয়ে এসেছে। একদিকে পদ্মা বা গঙ্গা অন্যদিকে ভাগীরথী—দুটো নদী সমান্তরাল গতিতে দু'মাইল বয়ে এল বিশ্বনাথপুরের কাছে। মাঝখানে তার গড়ে উঠল চর। বিশ্বনাথপুর থেকে ভাগীরথী গতি পরিবর্তন করে

চলে এল দক্ষিণ দিকে। তারপর পলাশীর প্রান্তর ছুঁয়ে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে গেল। ভাগীরথী এই জেলাকে সমান দুই ভাগ করেছে। পূর্ব চরে তার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। জঙ্গীপুরের কিছুদূরে ভাগীরথীতে এসে পড়েছে বাঁশলই আর পাগলা নদীর মিলিত স্রোত। শক্তিপুরের কাছে এসে পড়েছে দ্বারকার জল। গঙ্গা ভাগীরথীর গতি পরিবর্ত্তন হয়েছে। গঙ্গার জল এখন ভাগীরথীতে এসে পড়ে না। তাই ভাগীরথীকে নির্ভর করতে হয় ছোটোনাগপুরের নদীগুলোর উপর। গঙ্গা থেকে বেরিয়ে এসেছে ভৈরব। নাম শুনেই মনে হয় একদিন এই নদী ছিল দুর্দান্ত। মহানন্দা যেখানে এসে গঙ্গায় পড়েছে তার কিছু দূর থেকে বেরিয়ে আসছে ভৈরব। অনেকে বলে ভৈরব আসলে একদিন ছিল মহানন্দা-তিস্তার শাখা। নদীয়া-মুর্শিদাবাদের সীমান্ত তৈরী করেছে জলাঙ্গী। এও গঙ্গার শাখা।
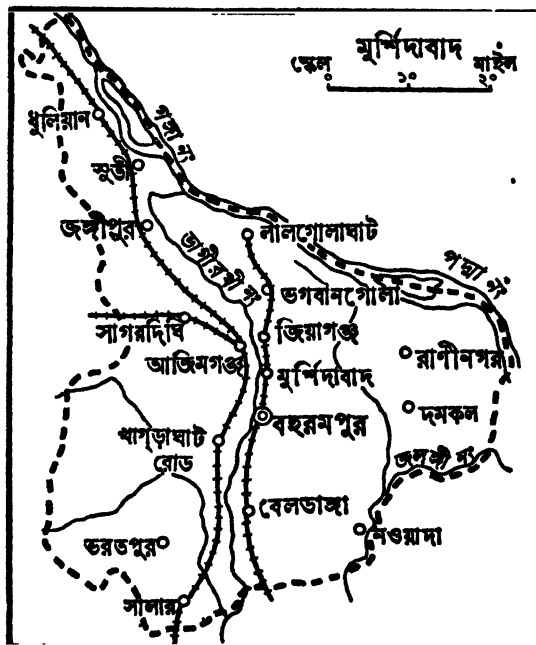
এই জলাঙ্গীর উত্তর ভাগটা শুকিয়ে এসেছে। তাই ভৈরব যখন জলধারা ঢেলেছে জলাঙ্গীতে, প্রাণ সঞ্চার হয়েছে তার। দুটো নদীর নামও একসঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে।

এ অঞ্চলে যা সবচেয়ে চোখে পড়ে তা হল এর বিল আর ঝিল। রাঢ় অঞ্চলে এদের প্রাধান্য বেশী। ভাগীরথীর পশ্চিম দিকে ময়ূরাক্ষী আর দ্বারকার মিলিত মোহনার কাছে হিজল বিল। ভৈরব আর জলাঙ্গীর মোহনায় কালান্তর বিল। ভাগীরথীর গতি পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে মোতিঝিল—মুর্শিদাবাদ শহরের নিকটে। এছাড়া ছোটো বড়ো বহু বিল ছড়িয়ে আছে এই জেলায়। এগুলোর সৃষ্টি হয়েছে নদীর খামখেয়ালিপনার জন্যে। সমগ্র অঞ্চলকে অস্বাস্থ্যকর পঙ্ককুণ্ডে ভরিয়ে তুলেছে এরাই। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ, জলনিকাশের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যের উন্নতি তাই এ জেলার বিশেষ সমস্যা।

এই জেলার উত্তর দিকে এসেছে রাঢ়। গঙ্গার দক্ষিণ থেকে ভাগীরথীর পশ্চিম দিক অবধি রাঢ় অঞ্চল। রাঢ়ের সমস্ত প্রকৃতি এখানে পরিস্ফুট। মাটি লাল, শক্ত, কাঁকরময়। উদ্বেলিত ভূমি-প্রান্তরে অজস্র পাহাড়ী ঝরনার ধারা; স্যাতসেতে বিল। পাহাড় নেই, জমি মাঝে মাঝে খুব উঁচু হয়ে উঠেছে। ভাগীরথীর পুবে, এই জেলার উত্তর-পুব দিকে বগড়ি অঞ্চল। গঙ্গা-ভাগীরথী-জলাঙ্গীর ধারাস্নানে এ জমি উর্বর, পেয়েছে পলিমাটির দান। আর এই বগড়ির রেশ টেনে এসেছে কালান্তর অঞ্চল,—দক্ষিণ-পুবের নিম্নভূমি। গাঢ় কালো এর মাটি।

মুর্শিদাবাদের গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫৬"। শীতগ্রীষ্ম মৃদুভাবাপন্ন।

বিলনদী থাকা সত্ত্বেও জল সেচের প্রয়োজন হয় রাঢ় অঞ্চলেই বেশী। মুর্শিদাবাদে মোট ১,৫৬,৬৯৫ একর জমিতে জল সেচ হয়। সরকারী ও বেসরকারী উপায়ে সেচ কাজ চলে। জীবন্তি-বাঁকী ৬৪০০ একর জমিতে জল সেচ করছে। তার উপর আছে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার দুটো মূল এবং দুটো শাখা খাল দিয়ে এ জেলার জল সেচের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বর্ধমান থেকে এসেছে কোপাই খালের অংশ। বীরভূম থেকে এসেছে ময়ূরাক্ষী-দ্বারকা খালের জল। রাঢ়ের সেচ পরিকল্পনা শেষ হলে আশা করা যায় আরো ২২২টা মৌজা উপকৃত হবে।

আবাদী জমির পরিমাণ ১,২৯০,৬০০ একর। ধান হয় ৬,৬৪,৬০০ একর জমিতে। বগড়ি অঞ্চলে হয় আউশ ধান আর কালান্তরে আর রাঢ়ের অঞ্চলে হয় আমন। অন্যান্য খাদ্যশস্য হয় ৪,১০,৬০০ একর জমিতে। পাট চাষ হয় ১,১৩,১০০ একর জমিতে। আখ, তামাক ইত্যাদির চাষ হয় ৯,০০০ একর জমিতে। এই জেলা প্রধানত কৃষিনির্ভর। শিল্পে কাজ করে মাত্র ৯·৭৭% জন লোক, ব্যবসা করে ৭·৮২% জন।

শিল্পের ভিতর রেশম শিল্পই প্রধান। বহুদিনকার শিল্প। কোম্পানিকে লব্ধ করেছিল মুর্শিদাবাদের রেশম। ১৬৫৮ সালে ইংরেজের রেশম-কুঠি স্থাপিত হল কাশিমবাজারে। প্রতিযোগিতা চলেছে তার ওলন্দাজ, ফরাসী আর আর্মেনিয়ানদের সঙ্গে। ১৬৭০ সালের দিকে ইংরেজরা রেশম কারবারে সুপ্রতিষ্ঠিত হল। জব চার্নক তখন এখানকার মালিক। বিলেত থেকে কোম্পানি তাঁকে পাঠাল ২,৩০,০০০ পাউণ্ড ব্যবসার জন্যে। চার্নক সাহেব তাঁর ১,৪০,০০০ পাউণ্ড খাটালেন মুর্শিদাবাদের রেশমের কারবারে।

ইংরেজের কারবার ছাড়া নবাব আলিবর্দি খাঁ শুধু রেশম থেকে শুল্ক পেতেন সাড়ে সাতাশি লাখ টাকা। নানারকমের কাজ ছিল তখন। একদিকে গুটি থেকে সুতো বার করা, সুতো কাটা, অন্যদিকে কাটা সুতো থেকে কাপড় তৈরী করা। কিন্তু কালক্রমে এত বড়ো কারবার গুটিয়ে এল। আজকের মুর্শিদাবাদ-রেশমের কারবারে আগেকার জৌলুস আর নেই। ভারত সরকার বহরমপুরে সেরিকালচার গবেষণাগার খুলেছেন।

মুর্শিদাবাদের আর-একটা প্রসিদ্ধ শিল্প হাতির দাঁতের কাজ। কিন্তু এরও অন্তিম দশা আজ। নবাবী গৌরব যখন বাঙলার মুখ ঝলসে দিচ্ছে তখনই হয়েছিল এই শিল্পের উৎপত্তি ও প্রসার।

এ ছাড়া আছে তাঁতের কাজ, সোনা-রুপোর কাজ আর মাটির কাজ। কলের ভিতর আছে মাত্র দুটো ধানকল আর দুটো তেল কল।

ইস্টার্ন রেলপথের বিভিন্ন শাখা এই জেলার ভিতর দিয়ে চলে গেছে। এর ভিতর এসেছে আজিমগঞ্জ শাখা। রানাঘাট থেকে আর-একটা শাখা এসেছে এখানে, গিয়েছে লালগোলা অবধি। বারহাওয়া কাটোয়া রেলপথ এ জেলার অনেকখানি জুড়ে আছে। বাঙলা ভাগ হয়ে যাবার পর এখানকার রাস্তার অনেক উন্নতি হয়েছে। অনেক ছোটো বড়ো রাস্তা এই জেলাকে অন্য জেলার সঙ্গে যুক্ত করেছে। গঙ্গা বা পদ্মা সারা বছরই নাব্য। অন্যান্য নদীতে গরমকাল ছাড়া আর সব ঋতুতে নৌকো যেতে পারে।

চারটে মহকুমা শহর বাদ দিলেও এখানে অনেক প্রসিদ্ধ স্থান আছে। থাকবার কারণও আছে। বাঙলার তিনটে ঐতিহাসিক উত্থান-পতনের সাক্ষী এই অঞ্চল। গয়ামাবাদ থেকে ত্রিবেণী অবধি

অঞ্চল জুড়ে হিন্দু আমলের কীর্তি গাঁথা। প্রাক্-মুসলমান যুগের বিগত সমৃদ্ধি এখানে। রাজমহল থেকে জঙ্গীপুর, জঙ্গীপুর থেকে মোর গ্রাম, বর্ধমানের খার গ্রাম থেকে সপ্তগ্রাম-পাণ্ডুয়া অবধি ১৭ শতকের মুসলমান সংস্কৃতির বিকাশভূমি, গৌড়ের গৌরব। গিরিয়া থেকে ভগবানগোলা আর মুর্শিদাবাদ অবধি নবাবী আমলের বাঙলার চিহ্ন। ভগবানগোলা অতীতকাল থেকে প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-কেন্দ্র। খাগড়ার পিতল-কাঁসার বাসন, আর মির্জাপুর-ইসলামচকের রেশম বিখ্যাত।

মালদহ

উত্তরে পূর্ণিয়া জেলা আর প. দিনাজপুর, পূর্বে প. দিনাজপুর আর পূর্ববঙ্গ, দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ আর পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমে সাঁওতাল পরগনা—এই যার চতুঃসীমা সে জেলা হল মালদহ। প্রাচীন বাঙলার গৌড়। সেকালে গৌড় আর বঙ্গভূমি ছিল একার্থক। একদা গৌড়ের নামে বাঙলার একটা বৃহৎ অংশ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। সেদিন গৌড়ের গৌরব ছিল সমগ্র বাঙলার গৌরব।

সে গৌড় আজ বিলুপ্ত। ইংরেজ আমলে যা ছিল মালদহ তার উপর বসল র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের ছুরি। অবিভক্ত মালদহের আয়তন ছিল ২,০০৪ বর্গমাইল। পুরনো মালদহের যতটুকু এখন পশ্চিমবঙ্গে এসেছে তার আয়তন হল ১,৩৯১ বর্গমাইল। লোক-সংখ্যা : ৯,৩৭,৫৮০। তার মধ্যে পুরুষ ৪,৭৬,৭৯৪, স্ত্রীলোক ৪,৬০,৭৮৬। এ জেলায় একটিমাত্র মহকুমা—ইংলিশবাজার।

গঙ্গা-ভাগীরথী ছাড়া এ জেলার বড়ো নদী হল মহানন্দা—জেলাকে উত্তর-দক্ষিণে ভাগ করেছে। নদীর পুব পাড়ে পুরনো মালদহ, পশ্চিম পাড়ে ইংলিশ বাজার। এ নদীতে ভারী ভারী নৌকো যেতে পারে মালদহ অবধি। ইংলিশ বাজারের দক্ষিণে মহানন্দার সঙ্গে মিশেছে টাঙ্গন। বিহার পার হয়ে এসেছে কালিন্দী—ইংলিশ বাজারের কাছে মিশেছে মহানন্দার সঙ্গে। তারপর এই মিলিত স্রোত নিয়েছে পুনর্ভবাকে টেনে।

মহানন্দার দুই তীর দুই প্রকৃতির। পূর্বতীর বারিন্দ্রভূমি।

রুক্ষ কাঁকরভরা লালচে মাটির তরঙ্গ। গৈরিক উচ্চভূমি বৈশাখে রুদ্রমূর্তি। জল নেই। সবুজের দেখা নেই। বিরলবসতি গ্রাম। মাঝে মাঝে শালের ঝোপ। থেকে থেকে ধুলোর ঘূর্ণি।

কিন্তু শরতে? তখন রুদ্রের শিব-মূর্তি। সবুজ ঢেউ লাগবে আমনের। উঁচু মাটি ডুবে যাবে শ্যামশস্যের বন্যায়।

মহানন্দার পশ্চিম তীরকে আবার দু ভাগে ভাগ করেছে কালিন্দী। কালিন্দীর উত্তর তীরের নাম টাল, দক্ষিণ তীরের নাম দিয়ারা। টাল অঞ্চলে বন্যার জল দাঁড়ায়। এইখানেই মালদহের বিখ্যাত আমবাগান আর তুঁতের চাষ। দিয়ারা অঞ্চলে পড়েছে গঙ্গার পলি। বারিন্দ্র এলাকায় আবহাওয়া শুকনো। এখানে লু বয়। টাল আর দিয়ারা অঞ্চল শীতল। এখানে বৃষ্টিপাতের গড় ৫৬"।

এ জেলার আবাদী জমির মোট পরিমাণ ৮,০৩,৮০০ একর। তার ভিতর আউশ ধানের চাষ হয় ১,৮৪,১০০ একর জমিতে,
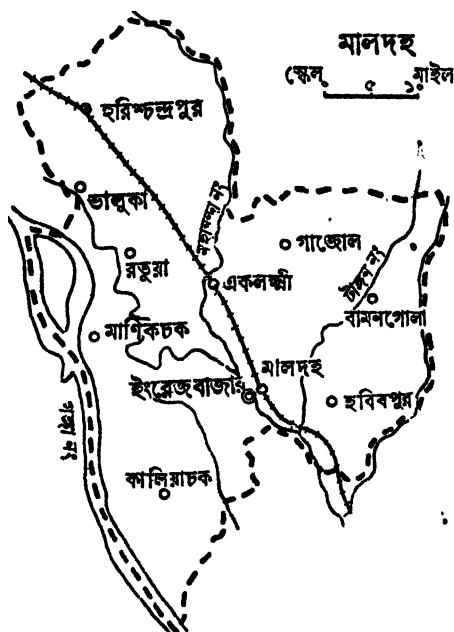
আমন হয় ২,৮৭,১০০ একর জমিতে, আর বোরো হয় ২৩,১০০ একর জমিতে। একর-প্রতি চাল হয় প্রায় ১১ মন করে। বারিন্দ্র ভূমিতে আমনের চাষই হয় বেশী। দিয়ারা অঞ্চলে হয় বোরো ধান। ঢাল অঞ্চল বন্যাপীড়িত। এখানে হয় অন্য ফসল। ধানের পরই নাম করতে হয় আমের। রাতুয়া, মানিকচক, খরবা, কালিয়াচক, মালদহ—আমের জন্যে বিখ্যাত। তুঁতের চাষের জন্যে আছে দিয়ারা অঞ্চল। ছোটোখাটো কয়েকটা সেচের কাজ হয়েছে এখানে। ৩০৬'৩০ একর জমির উপর গড়ে উঠেছে সরকারী কৃষি ফার্ম।

বৃহৎ শিল্প বলতে যা বোঝায় মালদহে তার একটিও নেই। থাকার মধ্যে আছে তিনটি ধানের কল আর একটা চিনির কল। কুটির-শিল্পই এখানে প্রধান—আর সেই প্রধানটি হচ্ছে রেশম-শিল্প। এখানকার কারিগর ওস্তাদ। হিন্দু রাজত্বে নাকি মালদার রেশমের কাজ বিখ্যাত ছিল। ওলন্দাজ আর ইংরেজরা বসিয়েছিল রেশমের কারখানা। তা টিকতে পারে নি। উঠে গেছে। কিন্তু উঠল না ইংরেজের রেশমের ব্যবসা। এখন কাঁচা রেশমের কাজই এখানে প্রধান। ইংরেজ বাজার রেশম শিল্পের আড়ত। রেশম-কীট পালন করার জন্য সরকারী কেন্দ্র আছে একটা। রেশমের সুতো কাটা শিক্ষা দেবার জন্য আছে সেরিকালচারাল স্কুল। তাঁতে তৈরী রেশমের কাপড় বেশী পাওয়া যায় সুজাপুর আর শেরশাহীতে।

মালদহে পাকা রাস্তা হচ্ছে ৪০ মাইল, কাঁচা রাস্তা ১৪৩৪ মাইল আর গ্রাম্য পথ হল ৫১৯ মাইল। ইংলিশ বাজার থেকে একটা রাস্তা গিয়েছে মানিকচকে, আর একটা রাস্তা গিয়েছে রাতুয়ায়—তারপর বিহারে। ইংলিশ বাজার থেকে আর-একটা রাস্তা

কালিন্দী পার হয়ে গিয়েছে দিনাজপুরে। কলকাতা থেকে মালদহে যাবার উপায় তিনটে। মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান-গ্যাঞ্জেস স্টেশন থেকে গঙ্গা পার হয়ে মোটর বাসে মালদহ, না হয়, সকরিগলিঘাট ও কাটিহার হয়ে। আর তা না হলে তিনপাহাড় জংশন হয়ে রাজমহলে গঙ্গা পার হয়ে মোটর বাসে আসতে হবে। এ জেলার ভিতর রেলপথ হচ্ছে নর্থ ইস্টার্ন রেলপথের মিটার গজ।

পশ্চিম দিনাজপুর

রাজনৈতিক দিক থেকে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার আবির্ভাব সেদিনকার ব্যাপার। ১৯৪৭ সালের বাঙলা ভাগের পর পশ্চিম দিনাজপুর এই অবয়ব পেয়েছে। ইতিহাসের দিক থেকে এর যা প্রসিদ্ধি তা পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্যে গিয়েছে। কিন্তু অনেকে মনে করেন এই পশ্চিমবঙ্গীয় জেলাতেও প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ প্রচুর। উপযুক্ত খনন আরম্ভ করলে অনেক সুফল পাওয়া যাবে।

বর্তমান পশ্চিম দিনাজপুর আয়তনে ১৩৮৫'৫ বর্গমাইল। এর উত্তরে ও পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান, দক্ষিণে মালদহ ও পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিমে বিহার। দুটো মহকুমা—বালুরঘাট আর রায়গঞ্জ। মোট জনসংখ্যা হল ৭,২০,৫৭৩ জন।

মহকুমা	মোট	পুরুষ	নারী
বালুরঘাট	৩,২৮,১১৪	১,৭১,২৬৯	১,৫৬,৮৪৫
রায়গঞ্জ	৩,৯২,৪৫৯	২,১২,৫৮৪	১,৭৯,৮৭৫

এ জেলার দক্ষিণ দিকে মালদহের বারিন্দ্র অঞ্চল। অসমতল জমি, পাহাড় নেই অথচ পাহাড়ের আভাস। মাটি কোথাও কোথাও উঁচু হয়ে উঠেছে। মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে অনেক ছোটো ছোটো নদী। নদী তাদের ঠিক বলা যায় না। অনেকটা পাহাড়ী নালা। বন্ধ্যা মাটি—হাজার চেষ্টায়ও ফসল ফলবে না। এর পরই খিয়র মাটির আরম্ভ। এক-ফসলা জমি। দোঁ-আশ পলিমাটি আছে কোথাও কোথাও। রঙ তার ফিকে ছাই। বৃষ্টিপাত গড়ে ৬০"। বন বলতে যা বোঝায় এখানে তার অভাব। টাঙ্গন নদীর

ধারে কিছু জঙ্গল দেখা যায়। এটা তার সম্পদ নয়—এ তার অতীতের আভাস। বোঝা যায় এখানে নেমে এসেছিল তরাইএর বনভূমি। তাই আজো পড়ে আছে আলগা-আলগা ছাড়া-ছাড়া
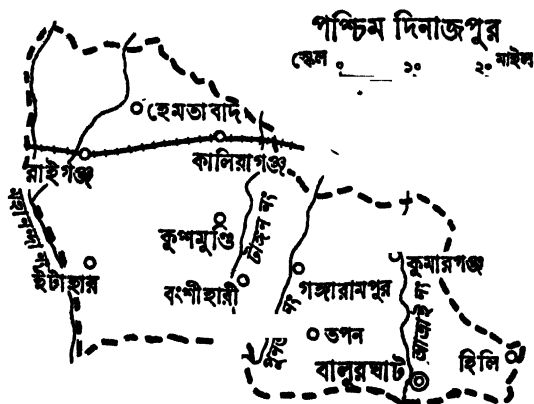
শাল। বছরের শেষে কৃষকরা জঙ্গলে আগুন ধরায়। চারা গাছ পুড়ে যায়; ছাই হয় পাতা। বর্ষার স্রোতে তারা গড়িয়ে আসে খেতে, সার হয়। তাই বোধ হয় শাল যা হতে পারত, তা আর হল না। এখন বড়ো জোর দুই বর্গমাইল বন আছে; তাও ব্যক্তিগত মালিকানায়।

পশ্চিম দিনাজপুরের নদীর ভিতর মহানন্দা, আত্রেয়ী, পুনর্ভবা, নাগর, টাঙ্গন প্রধান। এখনকার নদীর গতি সাধারণত উত্তর থেকে দক্ষিণে। পশ্চিম দিনাজপুরে অনেক বিল আর পুকুর দেখতে পাওয়া যায়। এরা সব হাজামজা নদী। তিস্তা যখন আত্রেয়ী দিয়ে জল-ভার পাঠানো বন্ধ করল, তখনই বোধ হয় এদের উৎপত্তি হয়েছে। আত্রেয়ীর উত্তর দিকে নাগর। পূর্ণিয়া আর পশ্চিম দিনাজপুরের

সীমান্ত ধরে বয়ে এসে মিলেছে মহানন্দায়। মালদহ আর পশ্চিম দিনাজপুরের অনেকখানি ঘুরে আবার পাকিস্তানে চলে গেছে। এ সব নদীর লক্ষ্য গঙ্গা। কিন্তু এরা নদী হিসেবেও প্রাণবান নয়। শুকিয়ে এসেছে এদের ধারা—সবাই নাব্য নয়।

মহানন্দা-পুনর্ভবা-নাগরের মিলিত মোহনার দিকে জমি ভিজে থাকে। বোরো ধান হয়। খিয়র অঞ্চলে এক-ফসলা জমি। শীত কালের ধান হয়। কোনো বার যদি ধান না হয়, তবে অন্য চাষ করার চেষ্টা হয়। বারিন্দ্র অঞ্চল একেবারেই নিষ্ফলা। পলিমাটির ভাগে ধান চাষ হয়, তা ছাড়া হয় সাধারণ মামুলি ফসল। ৭,৩৩,৮০০ একর জমিতে আবাদ করা হয়। তার ভিতর ধানের জমি ৫,৭৪,৮০০ একর। তা ছাড়া অন্যান্য খাদ্যশস্যে যায় প্রায় আবাদী জমির ৭%, পাট হয় ৪%, আখ তামাক ইত্যাদির ভিতর পড়ে মাত্র ১% জমি। চাষবাসের উন্নতির জন্যে সেচ ব্যবস্থার দরকার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এ ব্যাপারেও এই জেলা অনগ্রসর। সরকারী ও বেসরকারী চেষ্টায় মাত্র ৬,৯০৮ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। বৃহৎ শিল্প তো নেইই, কুটির-শিল্পও খুব উল্লেখযোগ্য নয়। এ জেলার ৪৮% জন লোক কৃষিজীবী। কুটির-শিল্পের ভিতর তাঁতের কাজই প্রধান। তা ছাড়া আছে মাতুর বোনা, ধামা ইত্যাদি তৈরী করা এবং বেতের কাজ কিছু কিছু।

এ জেলার নামকরা পথ হচ্ছে গোদাগিরি-দার্জিলিঙ রাজপথ। এক দিন এ পথটা আরো নামকরা ছিল। আর বহু পুরোনোও বটে। মুসলমান আমল থেকে আছে এ পথ। এখন এই পথ বালুরঘাট থেকে দুই দিক ধরে পাকিস্তানে চলে গেছে। তা ছাড়া বিচ্ছিন্ন ভাবে আছে রংপুর রোড, বগুড়া রোড, পূর্ণিয়া রোড,

বালুরঘাট রোড। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে খুব দ্রুতগতিতে আরো কয়েকটা বড়ো পথ তৈরী হয়ে গেছে। তার ভিতর প্রথমেই নাম করতে হয় খেজুরিয়াহাট-মালদহ-গাজোল রোডের। কালিয়াগঞ্জ থেকে রায়গঞ্জকে যুক্ত করেছে আরো একটা রাস্তা। আভ্যন্তরিক যোগাযোগের পথ হয়ে চাষের ও ব্যবসার খুব সুবিধে হয়েছে। এই রাস্তাটা এমন একটা দিক থেকে বেরিয়ে গেছে যে এ পথে ভিন্নমুখী আরো কতকগুলো রাস্তা পেয়েছে। তাই মালদহ আর পশ্চিম দিনাজপুর আরো নিকটে আসতে পেরেছে পরস্পরের। তা ছাড়া আছে গঙ্গারামপুর-তপন-বালুরঘাট রোড। রেলপথ নামে মাত্র। কাটিহার থেকে রাধিকাপুর অবধি মিটার গেজের পথ। বালুরঘাটে হয়েছে একটা বিমান বন্দর। ডেকোটা বিমান এখানে ওঠানামা করতে পারে। বাণিজ্যের খুব সহায়তা করেছে এই বন্দরটি।

রায়গঞ্জ, কুমারগঞ্জ, গঙ্গারামপুর আর কালিয়াগঞ্জের প্রসিদ্ধি বাণিজ্য-কেন্দ্র বলে। বালুরঘাট মহকুমা শহর। প্রাচীনতার খ্যাতি আছে তপনের। একটা বড় দীঘি আছে। তপনের কিছুদূরে দেখা যায় মুসলমান যুগের দুটি ভাঙা দুর্গ। মহীপাল দীঘিতে পাওয়া যাবে উত্তর-দক্ষিণে ৩৮০০ ফিট আর পূর্ব-পশ্চিমে ১১০০ ফিট একটা দীঘি। কাকচক্ষু জল। দীঘির পাড়ে হিন্দুর মন্দির, মুসলমানের মসজিদ। লোকে বলে, রাজা মহীপাল এই দীঘি করে গেছেন। দীঘির মাঝখানে ছিল নাকি তাঁর প্রাসাদ। পাড়ের উপর পড়ে আছে ইট—সেই অতীতের সাক্ষী। এখানে নীলকুঠি ছিল। কেরী সাহেব প্রথমে এখানে ছাপাখানা তৈরী করার চেষ্টাও করেছিলেন। নীল কুঠির চিহ্ন আজও অটুট। বানগড়ও বহু পুরোনো জায়গা। অনেক প্রাচীন নিদর্শন এখানে পাওয়া গেছে।

জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর সীমায় দার্জিলিঙ ও ভুটান, পুবে আসাম, দক্ষিণে কোচবিহার ও দিনাজপুর, পশ্চিমে দার্জিলিঙ ও পূর্ণিয়া। জেলার আয়তন ২,৭৭৮ বর্গমাইল। দুটি মহকুমা—সদর এবং আলিপুর দুয়ার। মোট জনসংখ্যা হল ৯,১৪,৫৩৮ জন। তার ভিতর—

মহকুমা	মোট	পুরুষ	নারী
সদর	৫,৪৬,১৪২	৩,০০,৩৫২	২,৪৫,৭৯০
আলিপুর দুয়ার	৩,৬৮,৩৯৬	২,০০,৭৩৮	১,৬৭,৬৫৮

প্রাকৃতিক পরিবেশের দিক থেকে জলপাইগুড়ি হিমালয়-আঞ্চলিক পার্বত্য প্রদেশ। ভুটান পার্বত্যমালার অংশ-বিশেষ এসে পড়েছে বক্সায়। চরিত্রগত ভাবে ডুয়ার্স এবং তরাই অভিন্ন। পাঁচ শ থেকে দু হাজার ফুট অবধি উঁচু মালভূমি হিমালয়ের পায়ের সঙ্গে মিশেছে। এখানেই চা-এর চাষ হয়। তবু জলপাইগুড়ি হিমালয়ের নিম্ন সমতলভূমি। এখানকার মাটি পাথর আর কাদায় মেশানো, বালির দানা মোটা। এরা সব নানা রকমের পলিমাটিরই রূপ। তিস্তা আর জলঢাকার মধ্যখানে শক্ত কালো মাটি দেখতে পাওয়া যায়।

ভূমিপ্রকৃতির এই বিচিত্রতাই সার্থক হয়ে ওঠে খনি অঞ্চলে। জয়ন্ত নদীর ধারে অর্ধ-পরিণত লিগনাইট বা ব্রাউন কয়লা পাওয়া যায়। বাগরাকোট এবং চন্দ্রাকোটে আছে কয়লার খনি।

বক্সা ডুয়ার্সে আছে তামার খনি। কিন্তু জলপাইগুড়ির প্রধান খনিজ সম্পদ হল ডলোমাইট। বর্ষায় পাহাড়ের গা বেয়ে স্রোতের সঙ্গে ডলোমাইট নেমে আসে সমতলভূমিতে।

তিস্তা আর মহানন্দা এখানকার প্রধান নদী। জলপাইগুড়ির পশ্চিমপ্রান্তসীমায় মহানন্দা। শিলিগুড়ির কাছে এসে মহানন্দার
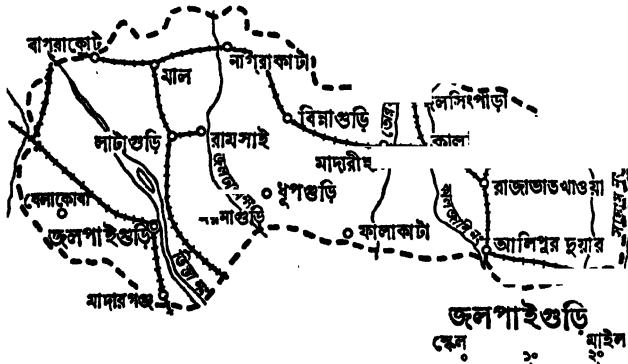
খাদ পাথুরে হয়ে উঠেছে। ভয়ঙ্করী নদী তিস্তা। উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে জলপাইগুড়িতে এসে, জলপাইগুড়ি শহরকে রেখে কোচবিহারের ভিতর গিয়ে পড়ল। বর্ষার সময়, মে-জুন মাসে, তিস্তার গর্ভ থেকে কামানের শব্দের মতো আওয়াজ মাঝে মাঝে শোনা যায়। ভুটান থেকে নেমে এসেছে জলঢাকা। দার্জিলিঙ জেলা পার হয়ে জলপাইগুড়িতে দক্ষিণমুখী হয়ে জেলার প্রান্তসীমা অবধি বয়ে এসেছে। তারপর হঠাৎ পুব দিকে বাঁক নিয়ে কোচবিহারের ভিতর ঢুকে পড়েছে। জলঢাকা বিস্তীর্ণ নদী, কিন্তু সেই তুলনায় অগভীর। বর্ষার সময় জলঢাকা হয়ে ওঠে সর্বনাশা, তখন তুমুল তার তুফান; তীব্র তার গতি। তোরসার জন্ম তিব্বতে।

ভুটানের ভিতর দিয়ে এসে ভারতবর্ষে নেমেছে। তারপর দক্ষিণমুখী হয়ে পশ্চিম দুয়ার পার হয়েছে। এর দুই পারে অসংখ্য নদী। তারা সবাই এসে মিলেছে তোরসায়। হিমালয় তার জলের অভাব রাখে নি। মাঝে মাঝে তোরসা সংকট ডেকে আনে। গত ৩০ বছর ধরে তোরসার গতি হয়েছে পূর্বমুখী। তারপর থেকে তোরসা উদ্দাম হয়ে উঠেছে। তীরভূমিতে তাই সর্বদাই ত্রাস। এ ছাড়া অন্য নদীর ভিতর রায়দক, করতোয়া আর প্রান্তনদী সংকোশ।

জলবায়ুর দিক থেকে জলপাইগুড়ি উপ-পার্বত্য জলবায়ুর ভিতর পড়ে। এখানে বৃষ্টিপাত খুব বেশী; কিন্তু তাপের পরিমাণ কম। নভেম্বর, ডিসেম্বর জানুয়ারিতেই কম বৃষ্টি হয়। বৃষ্টিপাত বেশী বলেই এ জেলাকে কখনো শুকনো দেখায় না। আর সেই জন্যই অরণ্য অঞ্চল এখানে এত সমৃদ্ধ। জলপাইগুড়িতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১২৯ ইঞ্চি। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৮০০ ফুট উঁচুতে বক্‌সা। তাই এখানে বৃষ্টির পরিমাণ ২১০ ইঞ্চি। মৌসুমী বাতাস যায় দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পুবে। আসামের খাসিয়া পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে পশ্চিম দিকে বাঁক নেয়। তখন বক্‌সা ছুঁয়ে যায় বলেই সেখানে বৃষ্টি পড়ে এত বেশী।

বিস্তারের দিক থেকে যেমন সম্পদের দিক থেকেও তেমনি সমৃদ্ধ হল জলপাইগুড়ির বনাঞ্চল। এ জেলার মোট বনাঞ্চলের পরিমাণ হল ৬৬২ বর্গমাইল। সরকারী সংরক্ষিত বন আছে পশ্চিম দুয়ারে—তিস্তা আর সংকোশের মধ্যবর্তী এলাকায়। তিস্তার পশ্চিম পারে ৭৭-বর্গমাইল-জোড়া ব্যক্তিগত বন। কিন্তু এই বন প্রধানত সমতল। কাছে এসে অবশ্য ব্যতিক্রম ঘটেছে। বক্‌সা পাহাড় ৫০০ ফুট থেকে হঠাৎ ৪০০০ ফুট উঁচু হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া কিছুটা

আছে খাস মহলের বন। এখানকার বনাঞ্চল নদীর পাশে। শালই এখানকার প্রধান গাছ। দীর্ঘ ঋজু শাল সরকারী আয়ের অন্যতম উৎস। শাল ছাড়া আছে শিত শিমূল খয়ের ইত্যাদি। এগুলো নরম কাঠ। প্যাকিং বাক্স বা দেশলাইএর কাঠির জন্য খুবই উপযুক্ত এই কাঠ। এ ছাড়া আছে নানান রকমের ওষধি।

জলপাইগুড়ি কৃষিনির্ভর জেলা। চা আর ধান এখানকার প্রধান ফসল। এ জেলার আবাদী জমির পরিমাণ ৭,৪৭,২৮৮ একর। তার ভিতর আউশ ধান হয় ৯৭০০০ একর জমিতে। একর-প্রতি ফসল হয় ১৬ থেকে ২০ মন। আর আমন ধানের জমির পরিমাণ ৪,০৭,৫০০ একর। এর একর-প্রতি ফলন হল ২০ মন করে। বাঙলা ভাগ হয়ে যাবার পর পাট চাষ এখানকার প্রধান চাষ হয়ে উঠেছে। জলবায়ু, মাটি এবং প্রকৃতিগত দিক থেকে জলপাইগুড়িতে পাট চাষের সম্ভাবনা প্রচুর। তাই পাট চাষের জমির পরিমাণ ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। আউশ ধানের জমিতে পাট চাষ হতে আরম্ভ করেছে। কোথাও কোথাও শতকরা ২৫ ভাগ আউশের জমি গ্রাস করেছে পাট। তিস্তার পশ্চিম পারে পাটের চাষের দারুণ উন্নতি ; পাটের পরিমাণও বেশী। পশ্চিম দুয়ারেও পাট হয়। এ জেলায় ২৪,৪০০ একর জমিতে পাট চাষ হয় আর তার একর-পিছু ফসল হল ৩·৪ মন। তামাক এখানকার অন্যতম মূল্যবান ফসল। সমগ্র পশ্চিম দুয়ারেই তামাকের চাষ হয়। তবে তিস্তা আর তোরসার মধ্যবর্তী অঞ্চলে তামাকের চাষ আরো ব্যাপক, জমি আরও উপযোগী। একর-প্রতি তামাকের ফলন ছয় থেকে আট মন। আখও এখানে বেশ ভালো জন্মায়। তামাক আর আখের জন্য আবাদী জমির প্রায় ২১% চাষ হয়। তা ছাড়া আছে নানা তৈলবীজের চাষ।

জলপাইগুড়িতে যদিও নদীর সংখ্যা প্রচুর, বৃষ্টিপাত যদিও অকৃপণ, তবু সেচের প্রয়োজন হয় এখানেও। কিন্তু এখানকার খেয়ালী পাহাড়ী নদীতে খাল কাটলে কখন কী হয় বলা যায় না। হয়তো সমস্ত নদীর গতিই পালটে যেতে পারে। সেচ কাজ চালানোর সবচেয়ে বড়ো অসুবিধে এই। তবু সরকারী খালে ১,১৭,৩২৮ একর আর ব্যক্তিগত চেষ্টায় ১,০৯,০২৫ একর জমিতে সেচ কাজ চলে।

২,০৭,১৩৩·৬০ একর জমিতে চা-এর চাষ হয়। সমস্ত পশ্চিম ডুয়ার জুড়ে চা-এর চাষ হয়। তাই শিল্প হিসাবে জলপাইগুড়ির প্রথম এবং প্রধান শিল্প হল চা। চা ছাড়া আরো কয়েকটা শিল্প আছে অবশ্য—কিন্তু তারা নগণ্য। ১৫১টা চা-এর বাগান এবং কারখানা ছাড়া একটা আছে চিনির কল; রেলের কারখানা একটা; চারটে ধানকল; ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা একটা আর একটা করে দেশলাই আর কাঠ-চেরাই কারখানা।

এই জেলায় পাকা রাস্তা ৪৫৩·৭ মাইল আর কাঁচা রাস্তা ৩৪৩ মাইল। রেলপথের ভিতর উত্তর-পূর্ব রেলপথ। তবে এখানে মিটার গেজের অংশ বেশী।

প্রসিদ্ধ স্থানের মধ্যে নাম করতে হয় সদর শহর জলপাইগুড়ির। বাণিজ্য-কেন্দ্র, আসাম রেলপথের স্টেশন। অন্য মহকুমা শহর আলিপুর দুয়ার। ১৮০০ ফুট উঁচু ভূমিতে বক্‌সা—একদিন সেনা-নিবাস ছিল—আজ কয়েদখানা; আসাম রেলপথের স্টেশন; ভুটানে যাবার পথ। ১৮৬৪ সালের ভুটান যুদ্ধের সময় এখানে সেনানিবাস তৈরী হয়। বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলপথের টারমিনাল স্টেশন ডাম ডিম—চা-বাগের এলাকার একেবারে ভিতরে।

কোচবিহার

১৯৫০ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে এই জেলা পশ্চিম বাঙলার ভিতর এসেছে। উত্তরে জলপাইগুড়ি, পুবে আসাম ও পূর্ব পাকিস্তান, দক্ষিণে পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিমে জলপাইগুড়ি ও পূর্ব পাকিস্তান—এই সীমানার ভিতর আবদ্ধ কোচবিহার জেলা আয়তনে ১,৩২২.৬ বর্গমাইল। কোচবিহার পাঁচটা মহকুমায় বিভক্ত। সদর, তুফানগঞ্জ, দিনহাটা, মাথাভাঙা, মেকলিগঞ্জ। সমস্ত জেলায় ৬,৭১,১৫৮ জন লোকের বাস।

মহকুমা	মোট	পুরুষ	নারী
সদর	১,৭১,৮৬৫	৯৪,৫৩১	৭৭,৩৩৪
তুফানগঞ্জ	৯৭,৭১৩	৫২,৪৭৫	৪৫,২৩৮
দিনহাটা	১,৬১,০৫৪	৮৫,৯৭৪	৭৫,০৮০
মাথাভাঙা	১,৪৮,৬৯১	৭৯,৪১৬	৬৯,২৭৫
মেকলিগঞ্জ	৯১,৮৩৫	৪৯,৪৬৪	৪২,৩৭১

এই জেলার উত্তরে তিস্তা ও সংকোশের মাঝখানের ভূভাগ ডুয়ার্স অঞ্চল। সমগ্র জেলাটাই উপ-পার্বত্য, সমতলভূমির প্রাধান্য। মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো বিল ও ঝিল দেখতে পাওয়া যায়। সমতল ভূমি কখনো কখনো উঁচু হয়ে গেছে। উচ্চতাও বেশী। খুব বড়ো রকমের বন্যা এলেও এই উঁচু জমি জলে ডুবে যায় না। নীচু জমি আবার খুবই নীচু—বিল থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চির উচ্চতা বজায় রাখে। চাষ-বাসের জন্যে উঁচু জমিতে, তামাক আর নীচু

জমিতে ধান—এই দুটো প্রধান চাষে জেলাটা ব্যবহৃত হচ্ছে। চাষের জমির পাশে কৃষকের বাড়ি ; চারিধারে বাঁশঝাড়—এই হচ্ছে গ্রামের রূপ। অরণ্য, অঞ্চল বলতে যা বোঝায় এখানে তা নেই। কিন্তু উত্তর-পূর্ব দিকে ঝোপ-ঝাড়, ঘাসের বাদাড় নজরে পড়ে। রাজপথের দুই পারে সার-সার শিশু গাছ। অতি সম্প্রতি এখানে শিশু এবং সেগুনের চাষ আরম্ভ হয়েছে। এখানকার মাটি পলি মাটির ; কিন্তু বালির আধিক্য বেশী। হালকা দোঁ-আশ পলি। খুব সহজে জল ভিতরে যায় না। শুকনো মাটিও সামান্য চাপে ভেঙে যায়। এই জমির বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে এর উপরে থাকে পলি-মাটির স্তর। তার তলায় বেলে মাটি, বেলে মাটির নীচে মোটা বালি। বালুময় চর ছাড়া কোচবিহারের সমস্তটাই উর্বর।

এখানে নদীনালার অভাব নেই। অজস্র ছোটোবড়ো নদী কোচবিহারকে খণ্ড-খণ্ড করেছে। সমস্ত নদীর যাত্রা উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে। এদের অনেকে রংপুর পেরিয়ে ব্রহ্মপুত্রে গিয়ে পড়েছে। পাহাড়ী নদী, গরমকালে শান্ত-শীর্ণ, বর্ষাকালে দুর্দান্ত। বর্ষার জন্য অপেক্ষাও করতে হয় না। পাহাড়ী অঞ্চলে সামান্য বৃষ্টি হলেই অকস্মাৎ নদীর জল বাড়বে, ফুঁসে উঠবে ঘুমন্ত নদী। প্লাবন তাই মুখের কথা। জলের তোড়ে ভেসে আসবে পাথর, নুড়ি—বিছিয়ে থাকবে নদীতট। পাড়ের ভাঙাগড়া এ জেলায় নিত্যই লেগে আছে। এ জেলার প্রধান নদী তিস্তা। সারা বছর ক্ষিপ্র স্রোত, এক বেগে বয়ে যায়। এ জেলায় নামকরা কোনো শাখানদী নেই এর। তিস্তার কূলে মহকুমা শহর মেকলিগঞ্জ। তামাকের ব্যবসা হয় এখানে প্রচুর। একদিন এই তামাকের প্রধান খরিদ্দার ছিল বর্মী ব্যবসায়ীরা। গতিপরিবর্তনকারী আরেকটি

খরস্রোতা নদী জলঢাকা। ভুটানের পাহাড়ী অঞ্চলে জন্ম নিয়ে জলঢাকা দার্জিলিঙ আর ভুটানের সীমান্ত-নির্দেশ করে এসেছে কোচবিহারে। নানাদিকে নানাভাবে প্রায় পঞ্চাশ মাইল বয়ে গিয়েছে জলঢাকা, নানা জায়গায় তার নানা নাম। কখনো কখনো
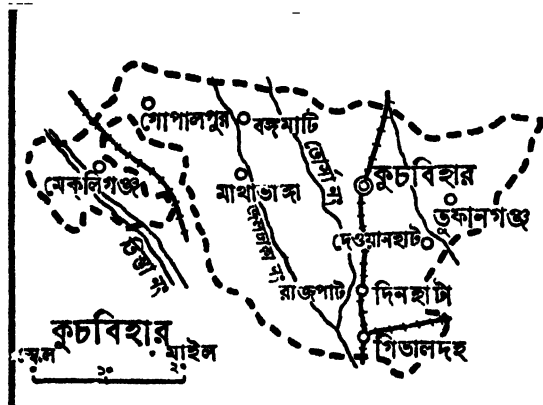
সে ব্যাপ্ত হয়েছে চার শ থেকে পাঁচ শ গজ। মহকুমা শহর মাথাভাঙা জলঢাকার পাড়ে। হালকা নৌকো বেশ কিছু দূর অবধি যেতে পারে। তোরসার উৎসমুখ তিব্বতে। ভুটান পার হয়ে কোচবিহারকে মাঝামাঝি কেটে তোরসা রংপুর দিয়ে গিয়েছে ব্রহ্মপুত্রে। এই জেলার ৬০ মাইল পথ ঘুরপাক খেয়ে পার হয়েছে তোরসা। এর গতি যেমন জটিল, তেমন এর মতিও। অজস্রবার পথ বদল করেছে তোরসা। উর্বর জমির ভিতর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ পথ বদল করে সেই সব জায়গাকে করে তুলেছে বালুচর আর বিল। মাথাভাঙার ভিতর দিয়ে কোচবিহারে এসে তোরসা মাইল কতক সোজাসুজি দক্ষিণ দিকে গিয়ে দু-ভাগ হয়ে গেল। তার একটা শাখার নাম হল ধরলা। সেও নানারকম ঘুরপথ নিয়ে দিনহাটা শহরের দু মাইল

পশ্চিমে সিংগিমারিতে পড়ল। আর অন্য ভাগটা আর নাম বদল করল না—তোরসাই থাকল তার নাম। এ ছাড়া আরো বহু ছোটোবড়ো নদী এ জেলার উপর দিয়ে বয়ে গেছে।

এ জেলার জমির গুণের তারতম্য বড় বেশী। জমির পরিচর্যা যদি ভালো না হয়, ভালো ফসল পাওয়া সম্ভব হয় না। কোচবিহারের জমি খুব দ্রুত তার উৎপাদনশক্তি হারাচ্ছে। উৎপাদনের দিক থেকে খাদ্যশস্য ছাড়া তামাক আর পাট অর্থকরী শস্য। সমগ্র জেলার আবাদী জমির পরিমাণ ৪,১০,৪৫১ একর। তার ভিতর আমন ধান হয় ২,২০,৭০৪ একর জমিতে, আর আউশ হয় ৬৬,৪৯৮ একর জমিতে। পাট চাষের ভৌগোলিক সুবিধা এ জেলার আছে। এখন সমগ্র জেলাতে ৬৫,০০০ বিঘা জমিতে পাট চাষ হয়। পাট চাষের ক্রমাগত প্রসার হচ্ছে। তুফানগঞ্জ মহকুমায় পাটের চাষ কম, দিনহাটা আর মেকলিগঞ্জে তার পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। অনাদৃত পতিত জমিতে হয় তামাক। তার জন্যে চাষের দরকার নেই—শুধু ভিজে বেলে জমি আর ঠাণ্ডা থাকলেই হল। কোচবিহারে তার তেমন অভাবও কোথাও নেই। বেশ কয়েক বছর গোবর-চোনা ইত্যাদি দিয়ে জমিকে একটু সারবান করা হয়; তারপর চলে তামাকের চাষ। আর-একটা চাষ এ জেলায় আছে—যা ঠিক চাষের পর্যায়ে পড়ে না—রেশমের সুতো হয়। এণ্ডি পোকার চাষ হয় সর্বত্র। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ভাবে মেয়েদের কাজ। এ জেলায় কোনো বড়ো শিল্প নেই। বেশীর ভাগ মানুষ চাষের উপর নির্ভরশীল। কয়েকটা কুটির-শিল্পকেও অবলম্বন করেছে এ দেশের মানুষ। তার ভিতর এণ্ডি প্রধান। তা ছাড়া আছে পিতল-কাঁসা, কুমোর আর ছুতোরের কাজ।

বঙ্গভঙ্গের পর কোচবিহারের রাস্তাঘাটের খুব দুর্দশা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিভিন্ন মহকুমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে রাস্তার অভাব নেই। নদী যদিও বহু আছে, কিন্তু গমনাগমনের কাজে এদের খুব দাম নেই। মহারাজার আমলে লালমণিরহাট থেকে কোচবিহার, কোচবিহার থেকে জয়ন্তিয়া অবধি রেলপথ পাতা হয়েছে। তা ছাড়া পাঁচটা মহকুমায় বিমান নামার কেন্দ্র তৈরী হয়েছে। বহু নদী থাকার জন্য রাজপথ তৈরীর অসুবিধে প্রচুর। তবু কোচবিহারের সঙ্গে মাথাভাঙা যুক্ত হয়েছে ইমিগ্রেশন রোড ওয়েস্ট দিয়ে। কোচবিহার থেকে গোয়ালপাড়া অবধি গিয়েছে ইমিগ্রেশন রোড ইস্ট।

পাঁচটা মহকুমা শহর বাদ দিলে প্রসিদ্ধ স্থানের নাম গিতালদহ, পাটগ্রাম, রাজপাই, হলদিবাড়ী—এগুলি বাণিজ্যকেন্দ্র।

দার্জিলিঙ

ভ্রমণবিলাসীর স্বর্গ এই দার্জিলিঙ প্রকৃতির আশীর্বাদ।

আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে চোখে পড়বে হিমালয়। তুষারশুভ্র পাহাড় আর আকাশ এক হয়ে মিলে গেছে দৃষ্টিসীমায়। চাওয়া যাবে না দক্ষিণে—ঘুম দাঁড়িয়ে আছে। চোখ এসে ঠেকবে রডোডেনড্রন গুচ্ছের উপর। ওদিকে ফুটেছে ম্যাগনোলিয়া, এদিকে ঘন সবুজ বন। ঘুম পার হয়ে টাইগার ছিল। একটু একটু করে উপরে উঠলে, একটু একটু করে দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়বে। পাহাড়ের মাথায় এলে চোখে পড়বে বাঙলার সমভূমি। তার নদীনালা, গাঢ় সবুজ বনমাঠ হাসতে হাসতে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। যে সব পাহাড় দৌড়ে আসছিল, তারা যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। যেন কোন আদিকালের দৈত্য—আস্তে আস্তে পাতালে চলে যাচ্ছে। দেখা যাবে গর্জনময়ী খেয়ালী তিস্তা, কৃশকটি মেচি, অরণ্যনন্দিনী মহানদী,—আরো আশ্চর্য রূপের সমারোহ অভিভূত করবে হৃদয়। উত্তরে তাকালে চোখ ফেরানো যাবে না, দক্ষিণে দৃষ্টি আটকাবে, পুব-পশ্চিম হরণ করবে হৃদয়। আরো একটু দূরে রাংন্নু উপত্যকা,—চার মাইল চওড়া হাজার ফুট গভীর। তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে মাইমন পাহাড়। মাইমনের পিছনে বরফ—বরফ জমে উঠেছে যেন। সারবন্দী বরফের পাহাড়। রোদ এসে পড়লে ঝিকিয়ে উঠছে সব—কুয়াশা এলে ঢেকে যায়। ওই বরফের পাহাড়ের একটি কাঞ্চনজঙ্ঘা। মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে আছে। তার আরো দূরে—এভারেস্ট। এই

দার্জিলিঙ—এই এর টাইগার হিল, আর কালিম্পঙ-কার্সিয়াঙের রূপবৈচিত্র্য, ভিক্টোরিয়া আর পাগলা ঝোরার জলপ্রপাত।

উত্তরে সিকিম, পুবে ভুটান, দক্ষিণে জলপাইগুড়ি ও বিহার আর পশ্চিমে নেপাল—এরই ভিতর দার্জিলিঙ। এর আয়তন হচ্ছে ১,১৯৯·৭ বর্গমাইল। চারটে মহকুমায় বিভক্ত এই জেলার লোকসংখ্যা হল ৪,৪৫,২৬০।

মহকুমা	মোট	পুরুষ	নারী
সদর	১,৬৯,৬৩১	৮৮,১৪৬	৮১,৪৮৫
কার্সিয়াঙ	৬৫,৭১৩	৩৪,১৭৬	৩১,৫৩৭
শিলিগুড়ি	১,১৬,৪৭৫	৬৭,৪৫৯	৪৯,০১৬
কালিম্পঙ	৯৩,৪৪১	৪৯,২৩৭	৪৪,২০৪

এ জেলার ৬৭১টা মৌজার ভিতর ৫৫টা এখনও জনবিহীন।

দার্জিলিঙ পার্বত্য অঞ্চল। এর মাথার কাছে হিমালয়। সিকিমে রয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। তার একটা শাখা সিঞ্চুলা দক্ষিণ দিকে বেরিয়ে এসেছে। দার্জিলিঙের সীমান্ত-রেখা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই পর্বতশ্রেণী। তার চারটি শৃঙ্গ দার্জিলিঙের শোভা বাড়িয়েছে। কারো উচ্চতাই ১১ হাজার ফিটের কম নয়। হিমালয়ের পায়ের তলার বনকে বলে তরাই। শিলিগুড়ি আর কার্সিয়াঙ মহকুমার পূর্বাংশ 'দার্জিলিং তরাই।' আর বাকিটা ডুয়ার্স। ডুয়ার্সের সবটাই চাষের জমি। হিমালয় থেকে যে ঢাল নেমেছে তার উপরই চা-এর আবাদ। তরাই-এর মাটি বেলে দোঁআশ। এটা পলিগঠিত ভূমি। পাহাড়ের জমি সাদা, লাল এবং কালো। কালো মাটি চাষের কাজে সবচেয়ে উপযোগী, তারপর লাল মাটি। সাদা মাটি একেবারে খারাপ—যদিও সার দিয়ে তার উন্নতি করা যায়।

দার্জিলিঙে লোহাযুক্ত মৃৎ পদার্থ দেখতে পাওয়া যায়। বাদামী রঙের হেমাটাইট আছে। আগে এখানে লোহা প্রস্তুত হত। রক্তি নদীর ধারে গ্রাফাইটের সন্ধান পাওয়া গেলেও ব্যবসা করা যায় না।

সিকিম থেকে তীব্র গতিতে নেমে এসেছে তিস্তা, দার্জিলিঙকে দুই ভাগে ভাগ করে ছুটে গেছে। তার পুব পাড়ে পড়েছে কালিম্পঙ। তিস্তাই জেলার অন্যতম প্রধান নদী। দার্জিলিঙ-নেপালের সীমান্তে মেচি নদী। কার্শিয়াঙের কাছে দার্জিলিঙ পাহাড় থেকে বেরিয়েছে মহানন্দা।

এখানকার জলবায়ু পার্বত্য ও স্বাস্থ্যকর। ভূমিপ্রকৃতি যেমন এর অসমান, বৃষ্টিপাতের তারতম্যও তেমন। দার্জিলিঙের নিম্নভূমি খুবই নীচু, আবার ওদিকে খাড়া পাহাড়। পৌষ থেকে চৈত্র মাস অবধি এখানে শীত। ৪৫° ডিগ্রিরও নীচে তাপ নেমে আসে। ফাল্গুন মাসেই তাপ সবচেয়ে কম। বৈশাখ থেকে শ্রাবণ মাস অবধি গ্রীষ্মকাল এখানে। তখন তাপ থাকে ৬০°। বার্ষিক বৃষ্টিপাত গড়ে ৮৬"।

একদিন সমস্ত দার্জিলিঙই ছিল অরণ্য। আজ আর তা নেই। এখন সরকারী বনের আয়তন ৪৫২ বর্গমাইল আর সমগ্র বনাঞ্চলের পরিমাণ ৪৮৭ বর্গমাইল। তরাই অঞ্চলই এ জেলার সবচেয়ে বড়ো অরণ্য-সম্পদের কেন্দ্র। এই তরাইএরও নানা ভৌগোলিক ভাগ আছে। সেই অনুসারে বনজ সম্পদেরও তারতম্য ঘটে। গাছ ছাড়াও এক ধরনের ঘাস এই বনের বিশেষ দান।

দার্জিলিঙে ইংরেজ শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হবার দু বছর পরও সেখানে শতখানেকের বেশী মানুষ বাস করত না। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি

দার্জিলিঙের পরিবর্তন ঘটলো—বিশেষ করে কালিম্পঙের। ১৮৪১ সালে দার্জিলিঙে প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে চা-এর চাষ আরম্ভ হল। কিন্তু তখনও সেটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর। ১৮৫৬ সালে প্রথমে কার্সিয়াঙ আর দার্জিলিঙে চা-এর চাষ আরম্ভ হল ব্যবসার জন্যে।

তার অল্প দিন পরে বিলেতে চা-এর প্রদর্শনী হল। তখন থেকে দার্জিলিঙে চা-এর ভাগ্য খুলতে আরম্ভ করল। ১৮৭১ সালে ৬২টা চা- বাগান ছিল। ১২,৩০৫ একর জমিতে চা-এর চাষ হত তখন। ১৮৯১ সালে চা-বাগানের সংখ্যা আরো বেড়ে গিয়ে হল ১৭৭টা বাগান আর জমির পরিমাণ দাঁড়াল ৪৫,৫৮৫ একর। তারপর থেকে বহু আপদ-বিপদের ভিতর দিয়ে গিয়ে চা শিল্প হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। দার্জিলিঙের চা তার বিশেষ সৌরভের জন্য বাজারে কৌলীন্য অটুট রেখেছে। ১৯৫১ সালে দার্জিলিঙে চা-এর বাগানের

সংখ্যা হল ১৩৮ আর সমগ্র চা-এলাকার পরিমাপ হল ৬২,৫৮০ একর। একর-প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ ৪৬৮ পাউণ্ড।

দার্জিলিংঙের পার্বত্য অঞ্চলেই ধান চাষ হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে ধান চাষের পরিমাণ খুবই কম। আউশ এবং আমন দুই ধরনের চাষই হয়। এই জেলার আয়তনের শতকরা '৮ ভাগে আমন চাষ হয়। ফসলের হার সাধারণ। এ জেলায় যা গম উৎপন্ন হয় তাও খুব নগণ্য। পাহাড়ী অঞ্চল বলে কমলালেবুর বাগানের সংখ্যা খুব বেশী এবং জেলার অন্যতম বাণিজ্য-ফল। সরকারী নিয়ন্ত্রণে সিনকোনার চাষ হয় এখানে, মংপুতে তার কারখানা। এ ছাড়া অন্য কারখানার মধ্যে আছে রেলের কারখানা একটা, একটা ধানকল আর একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা।

২১ মাইল পাকা রাস্তা আর ৩৩২ মাইল কাঁচা রাস্তা এই জেলার। কিন্তু এখনকার রাজপথ পাহাড়ী পরিবেশে মনোরম। নেপাল সীমান্ত রোড মেচি নদী ধরে উত্তর-দক্ষিণে চলে গেছে। শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পঙ হয়ে গ্যাংটকে গেছে সিকিম রোড।

তা ছাড়া দার্জিলিঙ থেকে কার্শিয়াঙ অবধি দার্জিলিঙ কার্ট রোড। সিভক থেকে তিস্তা ব্রিজের দিকে গিয়েছে তিস্তা ভ্যালি রোড, সেখান থেকে ওই রাস্তা গিয়েছে কালিম্পঙ হয়ে সিকিম। রেলপথের দিক থেকে আসাম বেঙ্গল রেল বাইরের সঙ্গে দার্জিলিঙকে যুক্ত করেছে। আর সমস্ত জেলাকে যুক্ত করতে সাহায্য করছে দার্জিলিঙ-হিমালয় রেলপথ। শিলিগুড়ি প্রসিদ্ধ রেল-জংশন।

প্রসিদ্ধির দিক থেকে আছে চারটে মহকুমা শহর। রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন ছিলেন মংপুতে। তিনধরিয়া বাণিজ্য-কেন্দ্র।

জেলার
কথা

●

বর্ধমান
বিভাগ

হাওড়া

উত্তরে হুগলী জেলা, দক্ষিণে রূপনারায়ণ নদী, পুবে হুগলী নদী, পশ্চিমে মেদিনীপুর জেলা—এই চতুঃসীমার মধ্যে যে জনপদ, তারই নাম হাওড়া। আয়তন : ৫৬৮ বর্গমাইল। মহকুমা দুটি : হাওড়া সদর আর উলুবেড়িয়া। জনসংখ্যা : ১৬,১১, ৩৭৩। ভেঙে দেখলে—

মহকুমা	মোট	পুরুষ	নারী
হাওড়া	৯,২৮,৪৫৬	৫,৩৯,২১৬	৩,৮৯,২৪০
উলুবেড়িয়া	৬,৮২,৯১৭	৩,৫০,৯৮৮	৩,৩১,৯২৯

বাঙলার ইতিহাসে হাওড়া সুপ্রাচীন নাম। বিপ্রদাসের কাব্যে বর্ণনা পাই—চাঁদসদাগর সাগরে পাড়ি দিয়েছেন। যেতে যেতে পথে পড়ল আড়িয়াদহ আর ঘুস্মুড়ি, কলকাতা আর বেতর। এই বেতরে নেমে বেতাইচণ্ডীতলায় পূজো দিলেন সদাগর। বন্দর হিসাবে বেতরের তখন খুব প্রসিদ্ধি। সপ্তগ্রাম যেদিন সমৃদ্ধির শিখরে, যেদিন সেখানে জমত দেশবিদেশের সওদাগরদের ভিড়, ভিড়ত তাদের বাণিজ্যতরী, সেদিন ছিল বেতরের সোনার দিন। তারপর ইতিহাসের কুটিল গতিতে, নানাদেশী বণিকদের স্বার্থের সংঘাতে হুগলীর পূর্বতীরে ফেঁপে উঠল কলকাতা, ডুবল বেতরের গৌরব।

বৈশিষ্ট্যহীন সমভূমি অঞ্চলের একটি জেলা হাওড়া। এ জেলার সমস্তটাই পলিমাটি দিয়ে গড়া। মজা নদীর খাদে এঁটেল মাটি, জলাভূমিতে কাদামাটি। নদীর তলায় বালি। উত্তর দিকে এঁটেল

আর গভীর দো-আঁশ মাটি, দক্ষিণে হাল্কা বেলেমাটির প্রাধান্য
জলবায়ু মৃদু-শীত-গ্রীষ্ম ।।শষ্ঠ মহাদেশায়। বৃষ্টিপাত গড়ে ৬০"।

এ জেলার দুই প্রান্তসীমায় দুই নদী—পুবে হুগলী, দক্ষিণে রূপনারায়ণ। জেলার মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে দামোদর।

বালীর কাছে এসে হুগলী নদী প্রথম এ জেলাকে ছুঁয়েছে। তারপর ঘুসুড়ি, হাওড়া, শালিমার পার হয়ে উলুবেড়িয়া। উলুবেড়িয়া ছাড়িয়ে খানিকটা নেমে দামোদরের স্রোত টেনে নিয়ে বাঁক নিয়েছে নদী। আরও খানিকটা পরেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে রূপনারায়ণ হুগলীর বুকে ; তখন তার গতিও ঘুরেছে অন্য মুখে।
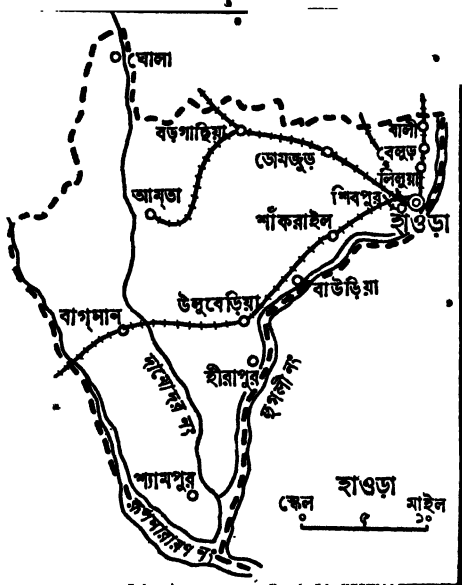
হুগলীর একটি শাখা সরস্বতী। হুগলী জেলার ত্রিবেণীর কাছ থেকে বেরিয়ে বালুটির কাছে হাওড়ায় এসে পড়েছে। তারপর ঘুরপথে ডোমজুড়, আন্দুল ছুঁয়ে আবার সাঁকরাইলের কাছে এসে মিলেছে হুগলীতে।

আমনা গ্রামের কাছে দামোদর এ জেলাকে প্রথম স্পর্শ করেছে। তারপর বাগনান পার হয়ে উলুবেড়িয়ার কাছে এসে পড়েছে

হুগলীতে। দামোদরের শাখা কানা দামোদর—জগৎবল্লভপুরে এ জেলায় প্রবেশ করেছে। তারপর কুড়ি মাইল পথ একা-একা পার হয়ে এসে উলুবেড়িয়ার এক মাইল উত্তরে পেয়েছে হুগলীর সঙ্গ। কানা আজ সত্যিই কানা—বড়ো দরিদ্র। কিন্তু অতীতে দামোদরের এ শাখাটি ছিল পূর্ণসলিলা।

সবচেয়ে বেশী পরিবর্তন হয়েছে দামোদরের। একদা দামোদর ত্রিবেণীর কাছে হুগলীতে গিয়ে পড়ত। কিন্তু কালক্রমে এই স্রোতোধারা রুদ্ধ হয়ে গেল। সপ্তগ্রামের অমন বাড়বাড়ন্ত বন্দর ভেঙে পড়ল। সরস্বতীর আজকের এই দৈন্যের দশাও বোধহয় সেই জন্যেই। তারপর দামোদরের জলধারার প্রধান বাহন হল কানা দামোদর। তারপর দামোদর আবার পথবদল করল।

রূপনারায়ণও পরিবর্তনশীল। জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে প্রথম দেখা দিল রূপনারায়ণ। তারপর মোড় ঘুরল দক্ষিণ-পুবে। পুব দিকে বাঁক নিতেই পেয়ে গেল হুগলীকে। এ জেলার ৯৫ মাইল পরিক্রমা করেছে রূপনারায়ণ। মাঝে মাঝে বিস্তার পেয়েছে নদী—কোথাও কোথাও তিন মাইল চওড়া। জোয়ারভাটার টান পড়ে রূপনারায়ণের কিছুদূর পর্যন্ত। নৌকো চলাচল করতে পারে বারোমাস।

বহু খাল আর ঝিল আছে হাওড়া জেলায়। বালী খাল নামকরা।

কৃষিতে সমৃদ্ধ হতে হাওড়ার কোনো বাধা ছিল না। পলিমাটির জমি, হুগলী-দামোদর-রূপনারায়ণের জলধারা, অসংখ্য খাল, বিল, ঝিল। প্রকৃতির উদার দাক্ষিণ্য। কিন্তু তবু যেন হাওড়ার শিল্পের দিকেই পক্ষপাত। এ জেলার আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ২,৭৯,৪০০ একর, চাষ হয় ২,৫২,৫০০ একর-এ। কিন্তু সেচের জল

পায় মাত্র ৪,৮০০ একর জমি। এর মধ্যে ধানের চাষ হয় ২,১৮,৪০০ একর জমিতে। জেলার উত্তরাংশে পাটচাষ হয় ভালো।

হাওড়া শিল্পপ্রধান জেলা। হাওড়ায় প্রথম কারখানা বোধহয় জাহাজ সারাইয়ের কারখানা। ১৮ শতকের কথা—তখন হুগলী ছিল আরো গভীর, আরো প্রশস্ত। একজন সাহেব বসালেন জাহাজ সারাইয়ের কারখানা। উন্নতির জন্যে হাওড়া তখন চেয়ে থাকত এই সারাই-কাজের দিকে। অন্য অন্য শিল্প তখন সবে গড়ে উঠেছে। তখন বালী খালের দক্ষিণ পাড়ে ছিল সার-সার চিনির কারখানা। তারপর হাওড়ায় রেল-স্টেশন বসল, পুল পাতা হল হুগলীর উপর দিয়ে। দেখ-দেখ করে বেড়ে উঠল হাওড়া। লোহার কল বসল,—বসল কাপড়ের কল, চটকল। হালে তৈরী হচ্ছে ইটের কারখানা।

এখন হাওড়ায় ১৩টা জাহাজ সারাইয়ের কারখানা আছে। ঘুসুড়ি থেকে হাওড়া শহর পর্যন্ত প্রসারিত এই সব কারখানায় দৈনিক কাজ করে ৭,৯২৯ জন শ্রমিক।

লোহা আর ইনজিনীয়ারিং কারখানার জন্যে হাওড়ার নামডাক সবচেয়ে বেশী। আসানসোল অঞ্চলের মতো রাঘব-বোয়াল লোহা-কারখানা অবশ্য নেই, কিন্তু ছোটো ছোটো কারখানা আছে অনেক আর সেখানে কাজও হয় নানা ধরনের। লিলুয়ায় রেলওয়ে কারখানা। নানা ধরনের ইনজিনীয়ারিং কারখানার সংখ্যা হল আট।

হাওড়ায় কাপড়ের কল তৈরি হয় কোম্পানির আমলেই। এখন ছোটোয়-বড়োয় মিলিয়ে কাপড়ের কল হল ১৩টা। গেঞ্জির কল ১০টা। রেশমের কল ১টা।

হাওড়ায় চটকল প্রথম স্থাপিত হয় ১৮৬৫ সালে। এখন এ

জেলায় ২৫টা চটকল, প্রতিদিন ৬৬,৭৩০ জন শ্রমিক এ-সব কলে কাজ করে।

এ ছাড়া হাওড়ায় আছে ৪টা ময়দা-কল, ৩টা ধানকল, ৬টা তেলকল, ১টা সিগারেটের কারখানা, ৪টা রঙকল, ৩টা সাবানের কারখানা, ৮টা কাচের কারখানা, ৩টা রবারের কারখানা, ২টা রাসায়নিক কারখানা, ৪টা দড়ি তৈরীর কারখানা, ৩টা মোটর মেরামতের কারখানা।

সমস্ত হিসাব নিলে দেখা যাবে, মাঝারি আর বড়ো মিলিয়ে হাওড়ায় কারখানার সংখ্যা ৪০৮, এবং প্রতিদিন ১,২৮,৯৯৬ শ্রমিক এই সব কারখানাকে চালু রাখে।

হাওড়ার রাস্তাঘাট উন্নত। পাকা রাস্তা ১৭৪ মাইল, কাঁচা রাস্তা ১৯৭৪ মাইল। শিবপুর থেকে বালি পর্যন্ত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, উলুবেড়িয়া থেকে রূপনারায়ণ পর্যন্ত উড়িষ্যা রোড। ইস্টার্ন রেল-পথের যাত্রা শুরু হাওড়া শহর থেকে। তা ছাড়া আছে দুটি লাইট রেলপথ। এ জেলার জলপথও প্রশস্ত আর নৌ-চালনযোগ্য।

হুগলী

ভারতবর্ষের সব কটি রাজনৈতিক বিপর্যয়ের স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে হুগলী আজ বর্ধমান বিভাগের একটা জেলা। গড় মন্দারনে মান্দার-রাজের নিশ্চিহ্নপ্রায় দুর্গ, পাণ্ডুয়ায় হিন্দু আমলের স্থাপত্য-নিদর্শন। পাঠান-মুঘল আমলে বহু ঝড়ঝাপটা গেছে হুগলীর উপর দিয়ে। মুঘল আমলে এসেছে পোর্তুগীজ বণিকেরা। ষোলো শতকে পোর্তুগীজ নৌকোয় হুগলী নদীর উপকূল আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। তারপর কালক্রমে হুগলী নদীতে অন্যদেশী বণিকের পতাকা উড়েছে—ওলন্দাজদের পতাকা। ১৭৩৯ সালে হুগলীর উপর নামল বর্গীর হাঙ্গামা। সবশেষে এল ইংরেজ। নানান সংঘাত-সংকট পার হয়ে, নানান ভাঙাগড়ার বিপর্যয়ের শেষে ১৮৭৯ সালে হুগলী মোটামুটি আজকের চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

বর্তমান হুগলীর উত্তরে বাঁকুড়া আর বর্ধমান জেলা, পুবে ভাগীরথী নদী, দক্ষিণে হাওড়া আর পশ্চিমে বাঁকুড়া আর মেদিনীপুর। ১২০৯.৩ বর্গমাইল-জোড়া এ জেলায় তিনটি মহকুমা। সমগ্র জেলার লোকসংখ্যা: ১৫,৫৪,৩২০।

মহকুমা	মোট	পুরুষ	নারী
সদর	৪,৫৪,৫৭৩	২,৩৭,৯২৭	২,১৬,৬৪৬
শ্রীরামপুর	৭,২৯,৩৩১	৪,০০,০০১	৩,২৯,৩৩০
আরামবাগ	৩,৭০,৪১৬	১,৮৫,৯৯৫	১,৮৪,৪২১

ভূমিপ্রকৃতির দিক থেকে এ জেলা সমভূমির সগোত্র—ভাগীরথী-

হুগলীর পলিমাটিতে গঠিত নতুন মাটি। পাঁচ থেকে দশ ফুট পর্যন্ত গভীর পলিস্তর—তার তলায় পুরু এঁটেল মাটি। সরস্বতী নদী যে পলি বয়ে আনে তা কিছুটা এঁটেল। দামোদর আর দ্বারকেশ্বরের মাটি বালি-ভরা।

হুগলীর ভিতরে গোত্রছাড়া হল গোঘাট—এখানে যেন রাঢ়ের রূপের আভাস লেগেছে। মাটিতে কাঁকর। এ জেলার অন্য সব জায়গা নতুন পলিতে গড়া, গোঘাট গড়া পুরনো পলিতে।

বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্বাভাবিক—গড়ে প্রায় ৫১"। মাটি আর মেঘের আনুকূল্য থাকলেও অজন্মা আর অনাবৃষ্টি এ জেলার অনেক ক্ষতি করে গেছে।

নদীর কাছে এ জেলা অনেক ঋণী। এর অতীত সমৃদ্ধি প্রধানত নদীরই দান। ভাগীরথী, দামোদর, দ্বারকেশ্বর—এই তিনটি হল এ জেলার প্রধান নদী। এ ছাড়া অ-প্রধানের সংখ্যাও কম নয়। আর আছে অসংখ্য বিল।

জেলার পূর্বসীমারেখায় ভাগীরথী বা হুগলী। নদীতে জোয়ার-ভাটা খেলে। জোয়ারের টান যায় নবদ্বীপ পর্যন্ত, বান ডাকলে বাঁশবেড়ে অবধি সাড়া জাগে। বারো মাস নৌকো আর বজরা চলে, বর্ষার দিনের স্টীমার চলে ত্রিবেণী পর্যন্ত। বর্ধমান থেকে বেরিয়ে বেহুলা এসে মিশেছে হুগলীতে। দামোদর থেকে বেরিয়েছে কুন্তী, তারপর নানা পথ ঘুরে হুগলীকে এসে ছুঁয়েছে। কুন্তীর প্রথম অংশের নাম কানানদী, শেষ অংশের নাম মগরা খাল। একদা এই পথ দিয়েই দামোদরের প্রধান স্রোতোধারা বইত।

এ জেলার ৫,৯৩,৮০০ একর জমিতে—অর্থাৎ মোট জমির শতকরা ৭৭ ভাগে—চাষ-আবাদ হয়। তার মধ্যে ধানের চাষ হয়

৪,৭২,১০০ একর জমিতে। ধানই এ জেলার প্রধান কৃষিজ। আউশ, আমন, বোরো—তিন রকম ধানই হয়। অন্যান্য কৃষিজ হল—পাট,

গম, নানারকম ডাল, সামান্য পরিমাণে আখ আর তামাক—আর পান। আলুর ফলনও ভালো।

অন্যান্য জেলার মতো হুগলীতেও সেচের প্রয়োজন বেশী। সরকারী খাল হল ইডেন খাল, ট্রান্স-দামোদর খাল, কুন্তী-চন্দননগর খাল, সরস্বতী খাল। এই সব খাল থেকে ৮১,৮৯২ একর জমিতে জলসেচ হয়। এ ছাড়া আছে বেসরকারী ব্যবস্থা—খাল, পুকুর, কুয়ো ইত্যাদি।

কৃষির চেয়ে হুগলীর গুরুত্ব তার শিল্পে। এখন এ জেলায় চটকল ১৫টি—দৈনিক গড়ে ৫৮,২৮৬ জন শ্রমিক এ-সব কারখানায় কাজ করে। সুতী-কল হল ৬টা। রেশমী সুতোর কারখানা মাত্র একটি। ইনজিনীয়ারিং কারখানা ছোটোয়-বড়োয় ১০টি—দৈনিক নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ১,৯১৩। হাড় ও সার কারখানা ২টি, রাসায়নিক কারখানা ৫টি, তেলকল ২টি, রবারের কারখানা ১টি, ধানকল ২১টি। ৫০-মাইল-দীর্ঘ নদীতীরবর্তী শিল্পাঞ্চলে লোকবসতি প্রতি বর্গমাইলে ১০,১১৫—যেখানে গ্রামাঞ্চলে প্রতি বর্গমাইলের ঘনতা হল ১,০৩০।

হুগলী জেলার এ শিল্পসমৃদ্ধি হুগলী নদীরই দান।

নদীর গতিপথের সমান্তরালভাবে উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গেছে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। তা ছাড়া বড়ো রাস্তা হল—চুঁচুড়া-দশঘরা রোড, শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর রোড, আরামবাগ-চাঁপাডাঙা রোড, আরামবাগ-গড়বেতা রোড, আরামবাগ-গৌরহাটি রোড।

বর্ধমান

বর্ধমানের নামের সঙ্গে বাঙলাদেশের বহুদূর ইতিহাস জড়িয়ে আছে।

গৈরিক মাটির দেশ বর্ধমান। উত্তরে সাঁওতাল পরগনা, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ; পুবে নদীয়া; দক্ষিণে হুগলী, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া; পশ্চিমে মানভূম—এই হল বর্ধমানের চৌহদ্দি। আয়তন ২,৭১৬ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ২১,৯১,৬৬৭। মহকুমা হিসাবে -

মহকুমা	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
সদর	৮,০২,০৫৭	৪,২০,০৪৮	৩,৮২,০০৯
আসানসোল	৭,৬৯,২৬৫	৪,২৭,২৮৪	৩,৪১,৯৮১
কালনা	৩,০৫,৭৫১	১,৫৪,৯৪৮	১,৫০,৮০৩
কাটোয়া	৩,১৪,৫৯৪	১,৫৮,৪৮১	১,৫৬,১১৩

বর্ধমান রাঢ়ের দেশ। বর্ধমান সদর, কালনা আর কাটোয়া—এই তিন মহকুমা পুরনো পলিতে গড়া। এ অঞ্চলের মাঝে মাঝে জলা, মাঝে শালবন। আসানসোল মহকুমা কঙ্করাকীর্ণ তরঙ্গায়িত পাহাড়ী দেশ। একদিকে ছোটোনাগপুরের পাহাড়ী অঞ্চল, অন্যদিকে গণ্ডোয়ানা পর্যায়ের শৈলশ্রেণী এই জায়গাটাকে একেবারে আলাদা করে সাজিয়ে দিয়েছে। বর্ধমানের পশ্চিমের সবটুকু আর পুবের বেশ খানিকটা ছোটোনাগপুর-মানভূম-সিংভূমের পাহাড়ী মাটির সগোত্র। কোথাও কোথাও শিলাস্তর থেকে সোজাসুজি মাটি তৈরী হয়েছে। সেই মাটির রঙ লাল। অন্য দিকে এসে মিশেছে গণ্ডোয়ানা শৈলশ্রেণী। তাই দেখা যায় মোটা-মোটা লাল বালি।

লাল মিহি-মাটি আর লাল বালি-মাটি—এই দুই ধরনের মাটি যেখানে যেখানে এসে মিশেছে সে সব জায়গা আখ চাষের পক্ষে খুব ভালো। বৃষ্টির পর রোদ উঠলেই এ মাটি পাথরের মতো কঠিন হয়ে যায়। আবাদী জমি নতুন পলি দিয়ে গড়া। মাটি কাদা-কাদা, বর্ষার পরই পড়ে পলির আস্তরণ। নদীর ধারের জমির উপর তাই কৃষকের বড়ো মায়া।

জলবায়ুর দিক থেকে বর্ধমানের বৃহত্তর অংশই উচ্চতাপ-ও অল্প-বারিপাত-বিশিষ্ট মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত। গ্রীষ্মে এ সব অঞ্চলের উপর দিয়ে শুকনো ঝোড়ো বাতাস বয়ে যায়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বৃষ্টিপাত এক ইঞ্চিরও কম। জুন-জুলাই মাসে বৃষ্টি পড়ে ১৪"।

বর্ধমানের পূর্ব প্রান্তে ভাগীরথী। দক্ষিণে দামোদর। উৎসমুখ থেকে দামোদর দক্ষিণ-পুব মুখে আসছিল, কিন্তু বর্ধমানের দু মাইল পশ্চিমে দক্ষিণমুখী হয়ে নেমে এল হুগলী-হাওড়ায়। দামোদরের দুটি শাখা—মুনিয়া আর সিঙ্গারান এসে পৌঁছেছে আসানসোলে। উত্তরে বইছে অজয়—গতি তার ভাগীরথীর দিকে। ছোটো ছোটো নদী আছে কয়েকটি—ব্রাহ্মণী, কানা, তামলা, বাবলা, ধলকিশোর।

নদী কম নয়—কিন্তু তারা সব পাহাড়ী নদী। বর্ষায় জলে টইটুম্বুর, কিন্তু জমি যখন জল চায় নদীতে তখন জল নেই। সেচের ব্যবস্থা না হলে বর্ধমানের চাষী তাই নিরুপায়। এ জেলায় বড়ো বড়ো দীঘি আছে, পুকুর আর কুয়োও অসংখ্য। কিন্তু সংগঠিত উপায়ে সেচের ব্যবস্থা প্রথম হল ইডেন খাল কেটে। বাইশ মাইল লম্বা খাল। দামোদরের জলে এর পুষ্টি—সেই জলে ২৩,৩৫৩ একর জমির তৃষ্ণা মেটে। দামোদর খাল লম্বায় ২৬ মাইল—১,৭৪,২০৫ জমিকে

জল যোগায়। এই দামোদর খাল থেকে আর-একটা খাল বেরিয়েছে —সেও প্রায় ২১ মাইল লম্বা। কিন্তু অদ্ভুত ফল পাওয়া যাবে যখন দুর্গাপুরের বাঁধ বাঁধা শেষ হবে। দুর্গাপুরের বাঁধ বাঁধার ফলে কানা আর কানা দামোদর এই দুটো নদীই প্রাণ ফিরে পাবে।
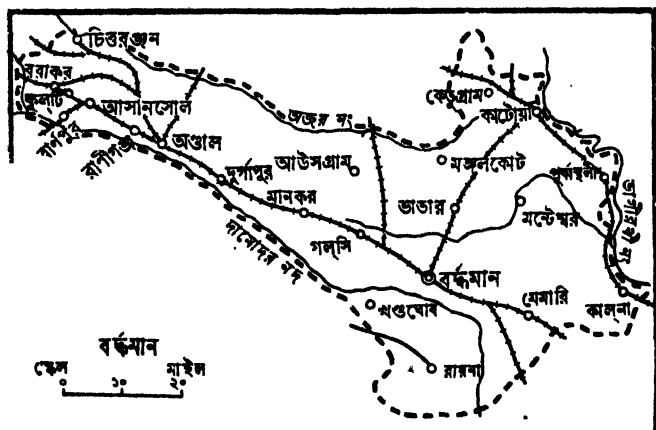
আসানসোল থেকে কলকাতা পর্যন্ত একটা খাল কাটা হবে। ১৪৪৪০ বর্গমাইল জমি এই পরিকল্পনার দ্বারা উপকৃত হবে।

বর্ধমানে আবাদী জমির পরিমাণ ১০,০৮,৫২৬ একর। ধানের চাষই বেশী। তিন জাতের ধানই জন্মায়। সবচেয়ে বেশী হয় আউশ —প্রতি একরে প্রায় ৮½ মন। আমনের ফলন প্রতি একরে প্রায় ১১½ মন। পাটের চাষ ভালোই হয়—কালনা আর জামালপুর অঞ্চলেই পাটের চাষ বেশী। আলুও এ জেলায় ফলে ভালো—একরে প্রায় ৯০ মন। আখের চাষে আছে ৯০০০ একর জমি—ফলন একর-প্রতি ৬০ মন।

বর্ধমানের প্রধান খনিজ হল কয়লা। রানীগঞ্জকে বলা যায়

কয়লার রাজধানী। রানীগঞ্জের কয়লা-অঞ্চল বলতে বোঝায় রানীগঞ্জের কয়েক মাইল পুব থেকে বরাকরের ধার অবধি এলাকা। পুবে-পশ্চিমে তার বিস্তার ৫০ মাইল, উত্তরে-দক্ষিণে ২০ মাইল। কোলিয়ারির সংখ্যা ২০৫, বছরে কয়লা ওঠে ১০ লক্ষ টন।

রানীগঞ্জ অঞ্চলে লোহাপাথর হেমাটাইট কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়। তবে এখানে যে বিরাট দুটি লোহা কারখানা গড়ে উঠেছে তা অবশ্যই রানীগঞ্জের হেমাটাইটের ভরসায় নয়। বিহার আর উড়িষ্যা থেকে এখানে কাঁচামাল আসে। আসানসোল-রানীগঞ্জ শিল্পাঞ্চল সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, তাই তার পুনরাবৃত্তি আর করা হল না।

এ জেলায় রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ২০৭৬ মাইল। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড প্রায় ৯৮ মাইল এই জেলার ভিতর দিয়ে গেছে। রেলপথ আছে ২৬৩ মাইল। এ জেলার নদীতে স্টীমার চলতে পারে না কিন্তু নৌকো চলাচল করে।

বীরভূম

সাঁওতালী ভাষায় বীর শব্দের মানে বন। একদিন সমস্ত বীরভূম জেলা ছিল গভীর জঙ্গল। সাঁওতাল বিদ্রোহেরও অন্যতম পীঠস্থান ছিল বীরভূম।

এখন বীরভূমের উত্তর দিকে বিহারের সাঁওতাল পরগনা, পুবে মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান, পশ্চিমে সাঁওতাল পরগনা, দক্ষিণে বর্ধমান। সদর বীরভূম বা সিউড়ি মহকুমা আর রামপুরহাট—এই দুটো মহকুমা নিয়ে ঐ জেলার আয়তন ১,৭০,৪২৯ বর্গমাইল। এখানে ১০,৬৬,৮৮৯ জন লোক বাস করে।

মহকুমা	মোট	পুরুষ	নারী
সদর	৬,৩৮,১৫৯	৩,২৩,৯৯৩	৩,১৪,১৬৬
রামপুরহাট	৪,২৮,৭৩০	২,১৬,৩৬৮	২,১২,৩৬২

কিন্তু বীরভূমে শহরে লোকের বাস অপেক্ষাকৃত কম। মোট লোকসংখ্যার ৬৮,৯৯৩ জন হলেন শহরবাসী আর ৯,৯৭,৮০৬ জন হলেন গ্রামবাসী।

ভুমিপ্রকৃতির দিক থেকে বীরভূম রাঢ়ের অন্তর্গত—লাল মাটির দেশ। এখানে গণ্ডোয়ানা পর্যায়ের পাললিক শিলার স্তর। এর উত্তর দিকে ছোটো ছোটো পাহাড় আর টিলা। অজয় নদীর উত্তর ভাগ থেকে বোলপুর অবধি দক্ষিণ ভাগ কিছুটা সমতল। এখানকার মাটি নানান রকমের। ধান, আখ, গম, ছোলার উপযোগী মেটেল মাটি যেমন দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি দেখতে পাওয়া যায় চাষের

পক্ষে খারাপ.মাটি—এঁটেল মাটি। লালচে মাটি, বাঘা এঁটেল, একবার শুকিয়ে গেলে হাড়ের মতো শক্ত হয়ে যায়। নদীর খাতে পলিমাটি—শস্যের পক্ষে বড়োই লোভনীয়। অন্যদিকে আবার বেলেমাটি বা বিন্দি মাটি। কাদামাটি আর বেলেমাটি মেশানো এক রকমের মাটি দোঁআশমাটি—চাষের পক্ষে বড়োই উপযোগী। এর রঙ কালচে। এ জেলায় কয়েকটা উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। দুবরাজপুরের ৫ মাইল দূরে বক্রেশ্বর তীর্থ। এখানে দেবী-প্রাঙ্গণে উষ্ণকুণ্ড। বক্রেশ্বরের নদীগর্ভেও কয়েকটা উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। জলে গন্ধকের গন্ধ।
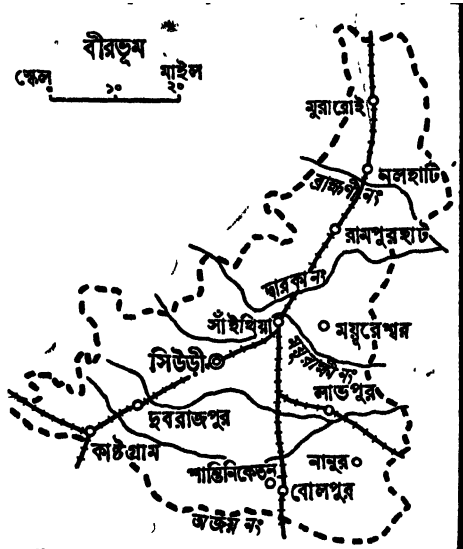
বীরভূমের জলবায়ু উচ্চবারিপাত-বিশিষ্ট মহাদেশীয় জলবায়ু। সর্বউচ্চ তাপের মাত্রা ১১১° আর সর্বনিম্ন তাপ ৬৪°। গড়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫৬"।

এ জেলার প্রধান নদী হল ময়ূরাক্ষী আর অজয়। তা ছাড়া আছে দ্বারকা, বক্রেশ্বর, কোপাই, চন্দ্রভাগা, ব্রাহ্মণী ইত্যাদি। ময়ূরাক্ষীর উৎপত্তি হয়েছে সাঁওতাল পরগনায়। তারপর সদর আর রামপুরহাট এই দুই মহকুমার ভিতর দিয়ে পশ্চিম থেকে পুবের

দিকে মুর্শিদাবাদে চলে গেছে। ছোটোনাগপুরের পাহাড় থেকে বেরিয়ে এসেছে অজয়। দেওঘরের পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পুবে দুটো পাহাড়ী ধারা একসঙ্গে মিশে যে জলস্রোত নামল তারই নাম অজয়। বর্ধমান এবং বীরভূমের সীমারেখা রচনা করছে এই নদী। তারপর কাটোয়ার কাছে এসে ভাগীরথীতে মিশেছে। বক্রেশ্বরের জন্ম হয়েছে বীরভূমে। আর এর উপনদীর নাম হল কোপাই। মুর্শিদাবাদের কাছে এসে ময়ূরাক্ষীর সঙ্গে মিশেছে বক্রেশ্বর। সাঁওতাল পরগনা থেকে নেমেছে দ্বারকা। তারপর বীরভূমের উত্তরাংশ পার হয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে চলে গেছে দ্বারকা। এর গতি মোটামুটি ভাবে ময়ূরাক্ষীর সমান্তরাল।

একদিন বীরভূম ছিল বনভূমি। আজ অবশ্য তা আর নেই। তবু এখানে আছে শাল, অর্জুন, মহুয়া, কেদ-এর বন। সদর মহকুমায় ১৩৫৯৭·১১ একর আর রামপুরহাট মহকুমায় ৮১৩·৩১ একর জমি বনভূমি। বনভূমি নষ্ট করে ফেলার ফল যখন হাতে হাতে পাওয়া গিয়েছে তখন বন-বসতির কাজও আরম্ভ হয়েছে। প্রায় ৬৪০ একর জমিতে নতুন করে গাছ বসানো হয়েছে, চেষ্টা হচ্ছে নতুন করে বনভূমি গড়ে তুলবার।

একদিকে যেমন বনভূমি রচনা আরম্ভ হয়েছে অন্যদিকে তেমনি সেচ ব্যবস্থার কাজ আরম্ভ হয়েছে। প্রাচীন প্রথায় যা সেচ হয় তা ছাড়া সরকারী পরিকল্পনায় সেচের কাজ আরম্ভ হয়েছে। সরকারী প্রচেষ্টায় প্রায় ২৪টা ছোটোখাটো সেচ পরিকল্পনার রূপদান হয়ে গেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা—প্রায় ৭ হাজার একরের বেশী জমিতে সেচ করা সম্ভব হবে। হিসেব করে দেখা গেছে যে একর-প্রতি ফলনও বেড়ে যাবে প্রায় আধ টন করে।

বরাকরের জন্য পাওয়া যাবে ২০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ। ময়ূরাক্ষীর উপর যে সেতুবাঁধটা তৈরী হয়েছে তার নাম তিলপাড়া বারাজ—সিউড়ি থেকে দু মাইল দূরে। তা ছাড়া আছে চক্রেশ্বর বারাজ, কোপাই বারাজ, দ্বারকা বারাজ, ব্রাহ্মণী বারাজ ইত্যাদি।

জনসংখ্যার অনুপাত থেকে বোঝা যায় বীরভূম কৃষিপ্রধান জেলা। তার প্রধান ফসলই হল ধান। এখানে মোট আবাদী জমির পরিমাণ হল ৮১৯,৮২৭·৯০ একর। তার প্রায় ৯২% জমিতে ধানের চাষ হয়। তিন রকমের ধান হয়; তবে আমনের ভাগটাই বেশী। বীরভূমের পশ্চিমাঞ্চলে ধানের চাষ ও ফলন দুটোই বেশী হয়। প্রায় ৭১৪,০৩১২ একর জমিতে ধান চাষ হয়। আউশের একর-প্রতি ফলন ১২ মন আর আমনের ১৫ মন। চাষবাসের দিক থেকে সদর মহকুমার চেয়ে রামপুরহাট মহকুমা আরো অগ্রসর—ফলনও বেশী। সদর মহকুমায় যখন ৯৩·৭৮ একর জমি পাট চাষ হয় আর তার একর-প্রতি ফলন হয় ১·৫ গাঁট তখন রামপুরহাটে পাট চাষ হয় ৫১৬·১০ একর জমিতে আর তার ফলন হচ্ছে ২ গাঁট করে। এখানে তামাক চাষ হয় ৬৯·৪২ একর জমিতে যার একর-প্রতি ফলন গড়ে ৬ মন করে। আখ চাষও হয় যার পরিমাণ হবে ৪৬৪৯·৭৪ একর জমি।

বৃহৎ শিল্পের দিক থেকে বীরভূমে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। দুই মহকুমাতেই ধানের কল আর তেলের কল আছে। তা ছাড়া কুটির-শিল্পই বীরভূমে প্রধান। তাঁত, রেশম এবং কাঁসা শিল্পই বীরভূমের উল্লেখযোগ্য সম্পদ। তাছাড়া ইসলাম বাজারে আছে লাক্ষা শিল্প আর ছুরি কাঁচি ইত্যাদির জন্যে আছে দুবরাজপুর, লোকপুর, রাজনগর। কুটির-শিল্পে শ্রীনিকেতনের অসামান্য দান।

এখানকার তাঁত এবং রেশমের কাজ শিল্প-রুচির উজ্জ্বল স্বাক্ষর—দেশবিদেশের অকুণ্ঠ প্রশংসায় এর উপযুক্ত মর্যাদা পেয়েছে।

কাঁচা, পাকা আর গ্রাম্য—এই তিন রকমের রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য হবে ১৫২০ মাইল। এই রাস্তার একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল,—প্রতিবেশী বিহারের সঙ্গে এর যোগাযোগ। সিউড়ি থেকে বাসে যাওয়া যাবে দুমকা, ভাগলপুর, মশানজোড়। রামপুরহাট থেকে রাস্তা আছে দুমকা যাবার। রেলপথের দিক থেকে ইস্টার্ন রেলপথ আর তার শাখা। আর আছে আহম্মদপুর-কাটোয়া রেলপথ। এ জেলার নদীপথে নৌকো যায়, কিন্তু স্টীমার যেতে পারে না। কোনো বিমানঘাঁটি এ জেলায় নেই। যুদ্ধের সময় তুম্বনিতে বিমানঘাঁটি গড়া হয়েছিল। কিন্তু আজ তা অকেজো।

বীরভূমের কোনো জায়গার নাম করতে গেলেই প্রথমে নাম করতে হয় শান্তিনিকেতনের। পৃথিবীর কাছে বীরভূম শুধু এই জন্যেই মুছবে না। বাঙলার জন্ম-জীবনের রূপকার রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিক্ষেত্র। কলকাতা থেকে ১০০ মাইল দূরে বোলপুর স্টেশনে নেমে আরো এক মাইল ভিতরে শান্তিনিকেতন।

শান্তিনিকেতনের পরে নাম করতে হবে কেন্দুবিল্বের। লোক-মুখে এর নাম আরো সহজ হয়ে এসেছে। লোকে বলে কেঁদুলি। এখানেই কবি জয়দেবের জন্মস্থান। মকর সংক্রান্তিতে মেলা বসে এখানে—অজয়ের ধারে। এই কেঁদুলির মেলাকে উপলক্ষ্য করে বাউল সম্প্রদায় বছরে একবার করে জড়ো হয়। ক্রমশ অবলুপ্তির পথে প্রাচীন বাউল সঙ্গীতের পদকারদের এই হল বার্ষিক চর্চার আসর।

বাঁকুড়া

প্রাচীন বাংলার অবিস্মরণীয় কীর্তি বাঁকুড়া। বাঁকুড়ার এই খ্যাতি আবার প্রধানত বিষ্ণুপুরের জন্য। ভারতে মুসলমান রাজ্য যখন নেহাত নাবালক অবস্থায় বিষ্ণুপুর তখন গৌরবের চূড়ায়। সাহিত্যে, সংগীতে, স্থাপত্যে, ঐশ্বর্যে বিষ্ণুপুর ঐতিহ্যমণ্ডিত। বিষ্ণুপুরের ইতিহাস তার রাজবংশের ইতিহাস।

এ জেলার আয়তন ২,৬৪৬·৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১৬,১৯,২৫৯।

	মোট	পুরুষ	নারী
বাঁকুড়া	৯,৬৫,৩৬৩	৪,৮৭,০৬৬	৪,৭৮,২৯৭
বিষ্ণুপুর	৩,৫৩,৮৯৬	১,৭৮,৭৮৭	১,৭৫,১০৯

মাটির প্রকৃতির দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে বাঁকুড়ার ভূমিপ্রকৃতি ছোটোনাগপুরের পাহাড়ী অঞ্চলের অংশবিশেষ। অবশ্যই এ অঞ্চল গণ্ডোয়ানা শৈলপর্যায়ভুক্ত। এই হল লাল মাটির দেশ—রাঢ় ভূমি। শক্ত লাল মাটির উপর কাঁকর—এই বাঁকুড়ার মাটির বিশেষত্ব। বাঁকুড়ার চেয়ে বিষ্ণুপুর আবার কিছুটা সমতল। শুশুনিয়া আর বিহারীনাথ বাঁকুড়ার দুটি বিখ্যাত পাহাড়। বাঁকুড়া থেকে ১৪ মাইল দূরে এই শুশুনিয়া পাহাড়। দু মাইল লম্বা আর ১৪৪২ ফুট উঁচু এই পাহাড়ে পাওয়া এক শিলালিপি বাঁকুড়ার ইতিহাসকে মহিমান্বিত করেছে। এই শিলালিপি পুষ্করনার অতীত গৌরবের সন্ধান দেয়। কেউ কেউ মনে করেন এই পুষ্করনার রাজাই রাঢ়ের

রাজা। আবার কেউ বলেন ইনি সমুদ্রগুপ্তের কাছে পরাজিত চন্দ্রবর্মা। বিহারীনাথ পাহাড়ও ১৪০০ ফুট উঁচু। এ ছাড়া আছে শাল-পিয়াল-পলাশের বন। কিন্তু বন ঘন হল বাঁকুড়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে। সরকারী নিয়ন্ত্রণে আছে ৩৪৮·৩২ বর্গমাইল বনভূমি,

আর বেসরকারী বনভূমির পরিমাণ হল ১৭১ বর্গমাইল। সরকারী পতিত জমিতে বনের আবাদ আরম্ভ হয়েছে এবং ৯৪৮·৮৪ একর পরিমাণ জমিতে গাছ রোপণ করা হয়েছে।

চাষ-আবাদের দিক থেকে ধান, আখ, তামাক, পাট ইত্যাদি সাধারণ ফসলই ফলে। এখানে মোট আবাদী জমির পরিমাণ ৯৮৬,৩০০·০০ একর। এর মধ্যে আউশ ধান হয় ১১৩,৪০০·০০ একর জমিতে, ফলন একর-প্রতি ৯·১০ মন। আমন ধানের জমির পরিমাণ ৭৮৪,৮০০·০০ একর; একর-প্রতি ফলন হল ১৫·৫৪ মন।

পাট চাষ হয় ১,৮০০'০০ একর জমিতে। একর-প্রতি ফলন হল ৩'১৭ গাঁট। এ ছাড়া অন্যান্য ফসলও আছে।

একদিকে মাটি রুক্ষ ও কাঁকরময়। আবার বাঁকুড়ায় বৃষ্টিপাত সবচেয়ে কম। এর ভিতর দিয়ে কয়েকটা নদী বয়ে গেছে সত্যি। কিন্তু তাদের প্রকৃতি ছোটোনাগপুরের পাহাড়ী নদীর। নদীগুলি হল দামোদর, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী, কংসাবতী। সারা বছর অনেক নদীতে জলই থাকে না। কৃষকেরও তাই হতাশার সীমা থাকে না। সেই জন্যে সেচ-ব্যবস্থাই এ জেলার কৃষককে বাঁচাতে পারে। কয়েকটা খালের পুনরুদ্ধার এবং সংস্কার করা হয়েছে। কয়েকটা খাল কাটা হয়েছে আবার। এই সেচ-ব্যবস্থায় প্রায় ৭৫৬৮ একর জমি জল পাবে। তার দরুন বাড়তি ফলন হবে প্রায় ৩,৩০২'৫ টন।

বাঁকুড়ায় শক্তি-চালিত শিল্প নেই। মূলত এটা কুটির-শিল্পের জেলা। কুটির-শিল্পে এ জেলার প্রসিদ্ধি অনেকদিনের। বিষ্ণুপুরের রেশম ও তসর শিল্পের কথা বাঙলার প্রত্যেকটা লোকই জানে। তার প্রধান রপ্তানি বাজার কলকাতা। গোপীনাথপুর, রাজগ্রাম, বামুনারি সুতী কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ। পিতল-কাঁসার জিনিসপত্রের জন্য আছে লক্ষ্মীসাগর। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের শাখ বাঙলার মেয়েদের কাছে মোটেই অপরিচিত নয়। ওদিকে আবার বাঁকুড়া মহকুমার লাক্ষা শিল্প। কোম্পানির আমল থেকে সোনামুখীতে স্থাপিত হয়েছে লাক্ষা কুঠি। আগেকার শিল্প আরো বিস্তীর্ণ হয়েছে; পুরোনো কালের সেই কুঠি আজো রয়েছে সেখানে। আর বিষ্ণুপুরের সুগন্ধি তামাক পক্ককেশ বৃদ্ধের পরম বন্ধু। বাঁকুড়ায় তামাক চাষ হয় ২০০,০০ একর পরিমাণ জমিতে, আর তার ফলন হয় একরে ½ টন।

বাঁকুড়ায় দুটো প্রাদেশিক রাজপথ আছে। একটার নাম

তালডাংরা-বানসা রোড। এ তালডাংরা থেকে বাঙলার শেষ সীমা বানসায় শেষ হয়েছে। বাঁকুড়া-তালডাংরা রোড বাঁকুড়া থেকে আরম্ভ হয়েছে,—শেষ হয়েছে তালডাংরায়। বাঁকুড়া-রানীবাঁধ রোড গিয়েছে বাঁকুড়া থেকে রানীবাঁধে। দ্বারকেশ্বর নদীর উপর ১০২০ ফুট লম্বা এক ব্রিজ বাঁকুড়ার পথঘাটের একটা সমস্যার সমাধান করেছে। দ্বারকেশ্বরের তাড়নায় আর বিপন্ন হতে হয় না বাঁকুড়াবাসীকে।

ছাতনা বাঙলার সাহিত্য-পিপাসু মানুষের কাছে প্রিয়। এখানকার মন্দিরে প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন। এর অপর নাম বাসুলি। অনেকের মতে এই চণ্ডীদাসের জন্মস্থান।

শুশুনিয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। শুশুনিয়া পাহাড় থেকে নেমেছে দুটো ঝরনা। বছরে তিনটে মেলা বসে এই ঝরনার ধারে।

বিষ্ণুপুর থেকে ২১ মাইল দূরে সোনামুখী। কোম্পানির সুতো আর কাপড়ের কল ছিল এখানে। এখানে বহু মন্দির আছে। তার ভিতর গোবিন্দদাসের মন্দির শিল্পকীর্তির নিদর্শন। সোনামুখী বৈষ্ণবদের তীর্থক্ষেত্র। প্রতি বছর শ্রীনবমীতে এখানে মেলা বসে।

দ্বারকেশ্বরের ধারে বিষ্ণুপুর মল্লরাজদের রাজধানী। আর খড়্গপুর-আসানসোল রেলপথের উপর পড়ল বাঁকুড়া। বাঁকুড়ার দু মাইল দূরে দ্বারকেশ্বরের উপর একেতশ্বর গ্রাম। এখানে একেতশ্বরের মন্দির আছে। এই মন্দিরের নাম থেকেই এসেছে গ্রামের নাম। অপরূপ সৌন্দর্যময় এই মন্দির বাংলার অন্যতম স্থাপত্যকীর্তি। চৈত্র মাসে এখানে বিরাট মেলা বসে।

মেদিনীপুর

মেদিনীপুর জেলার উত্তরে বাঁকুড়া জেলা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পুবে হাওড়া ও হুগলী, পশ্চিমে বিহারের সিংভূম, মানভূম, উড়িষ্যার বালেশ্বর ও ময়ূরভঞ্জ। পাঁচটা মহকুমায় বিভক্ত এই জেলার আয়তন হল ৫,২৫৩'১ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ৩৩,৫৯,০২২।

মহকুমা	মোট	পুরুষ	নারী
মেদিনীপুর	১,০৫৭,৬৫৮	৫,৪৩,৫০১	৫,১৪,১৫৭
কাঁথি	৭,৩৯,৮৪১	৩,৮১,১১৮	৩,৫৮,৭২৩
তমলুক	৭,৮৮,৪৩৮	৪,০৩,২৯৬	৩,৮৫,১৪২
ঘাটাল	৩,১১,৩৮২	১,৫৮,৯১৫	১,৫২,৪৬৭
ঝাড়গ্রাম	৪,৬১,৭০৩	২,৩১,৬২৯	২,৩০,০৭৪

বিচিত্র এর মাটি। সমুদ্রের ধারে এক রকম। আবার সেই সেই সমুদ্র ফেলে উত্তরদিকে এগিয়ে গেলে দেখা যাবে মাটির প্রকৃতি গিয়েছে বদলে। এখানে লেগেছে পাথুরে মাটির আঁচ, শক্ত কঠিন। আবার পুব-দক্ষিণে সমতল ভূমির সজীবতা। তার ভিতর দিয়ে বয়ে গিয়েছে রূপনারায়ণ আর সুবর্ণরেখা—দু ধারে দুই প্রান্ত ধরে। এদের মাঝে আছে শিলাবতী (শিলাই), কংসাবতী (কাঁসাই), কালিঘাই আর রসুলপুর।

একদিন মেদিনীপুরের ছিল বিপুল অরণ্য-সম্পদ। সভ্যতা আর আবাদের প্রয়োজনে নির্মূল হয়েছে তার অনেকখানি। শাল, মহুয়া, পলাশ, পিয়াশাল আর কুসুমের অরণ্য আজো মেদিনীপুরের পশ্চিম

দিকে ছায়া দিয়ে আছে। এরা ছোটোনাগপুর-ময়ূরভঞ্জের অরণ্যের জাত। ১৯৫৩ সাল অবধি খাস সরকারী অরণ্য অঞ্চল ১৯,৮৯১ একর। ব্যক্তিগত মালিকানার অধীন বনভূমির পরিমাণ ১,১৭,০৯১ একর। আবার সরকার-পরিচালিত ব্যক্তিগত বনভূমির আয়তন ২,৭৬,৫২১

একর। অরণ্য উচ্ছেদের বিষময় ফল হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে মেদিনীপুর। তাই পতিত জমিতে বন রচনা আরম্ভ হয়ে গেছে। ৩,০০৮ একর জমি এইভাবে কাজে লাগানো হয়েছে।

ধান, ডাল, আখ, চীনেবাদাম, আলু, পেঁয়াজ, পাটই মেদিনীপুরের প্রধান কৃষিসম্পদ। ১৯৫১ সালের হিসেবমতো এ জেলার মোট আবাদী জমির পরিমাণ ৭৭,৭৬,০০০ বিঘা, চাষোপযোগী পতিত জমির পরিমাণ ১০,২৮,০৭০ বিঘা।

আউশ আমন তুই ধরনের ধানই হয় এখানে। ফলন মোটামুটি ভালো। কিন্তু উত্তর আর পুব দিকে ধান চাষ হয় সবচেয়ে ভালো। কারণ দক্ষিণ দিকে বন্যার ভয়, পুব দিকে ভয় অনেকটা কম। আবার যে সব সেচ-পরিকল্পনা সরকারের হাতে আছে, যার কাজ অনেকখানি হয়ে গেছে বা হচ্ছে--তার সুফল পেয়ে মেদিনীপুর আরো সচ্ছল হবে।

নামকরা শিল্পাঞ্চল একমাত্র খড়্গপুরের রেলের কারখানা। ১৯০৪ সালে এই কারখানা প্রথম চালু হয়। তারপর একে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে পত্তন হয়েছে একটা বিরাট শহরের। সমস্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি-ধর্মের মানুষ একই শেডের তলায় কাজ করে যাচ্ছে। এখানে ইঞ্জিন তৈরী ও মেরামত হয়। অতি আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত এই কারখানা ভারতবর্ষের রেলপথের অন্যতম গৌরব।

এই বৃহৎ শিল্পকে বাদ দিলে কুটির-শিল্পের কথা পাড়তে হয়। কুটির-শিল্প একটা বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে নেই--সমস্ত জেলা জুড়ে তা ব্যাপ্ত। মেদিনীপুরে রেশম, তসর, মাতুর আর পিতল-কাঁসার কাজ হয় প্রচুর। কাঁথি মহকুমায় সমুদ্রের ধারে লবণ-শিল্প যথেষ্ট প্রসিদ্ধ। বছরে প্রায় এক লাখ মন লবণ তৈরী হয়।

উল্লেখযোগ্য রাস্তার ভিতর প্রথমে নাম করতে হয় মেদিনীপুর-বাঁকুড়া রোডের। এক দিকে রানীগঞ্জ, অন্যদিকে পুরুলিয়া—এর সঙ্গে এসে মিশেছে মেদিনীপুর-দাঁতন রোড। মেদিনীপুর থেকে বেড়িয়ে খড়্গপুর হয়ে ঝাড়গ্রামে পড়েছে মেদিনীপুর-ঝাড়গ্রাম রোড। আবার এই রাস্তার মাঝ থেকে বেরিয়েছে বারিপদা রোড—গিয়েছে ময়ূরভঞ্জের বারিপদায়। তা ছাড়া ইতিহাসপ্রসিদ্ধ তুটো রাস্তা আছে এখানে। একটা মেদিনীপুর-কেশপুর-ঘাটাল রোড। একদিন

পাণ্ডুয়ার সঙ্গে কর্ণসুবর্ণের যোগপথ ছিল এটা। অন্যটা তমলুক-পাঁশকুড়া-মেদিনীপুর রোড। আবার কাঁথি-দীঘা রোডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বেলদা-কাঁথি রোড।

কাঁসাই নদীকে রূপনারায়ণের সঙ্গে যুক্ত করেছে মেদিনীপুর হাই লেভেল ক্যানাল। ছত্রিশ মাইল দীর্ঘ স্থলপথ আভ্যন্তরিক চলা-ফেরার অনেক সুবিধে দিয়েছে। উড়িষ্যার সঙ্গে মেদিনীপুরের সংযোগ স্থাপন করেছে হিজলী টাইডাল ক্যানাল আর উড়িষ্যা কোস্ট ক্যানাল। একদিন এই পথে স্টীমারের যাতায়াত ছিল, আজ চলে শুধুই নৌকো।

এই জেলার প্রধান শহর মেদিনীপুর। বহুদিনের শহর, অতি-প্রাচীন এর উৎপত্তি। শ্রীচৈতন্য উড়িষ্যা যাবার পথে এখানে এসেছিলেন। আইন-ই-আকবরীতে বলা হয়েছে "সুবৃহৎ নগর"।

তমলুক অন্যতম মহকুমা শহর। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এই শহরের প্রতি অঙ্গে অতীত কীর্তির স্মৃতি। বৌদ্ধ যুগে তাম্রলিপ্তির নাম বহুদূর অবধি ছড়িয়ে পড়েছিল। সিংহবাহুর ছেলে বিজয় সিংহ নাকি তাম্রলিপ্তির তৈরী জাহাজে করে সিংহল যাত্রায় যান। এখান থেকেই নাকি বোধিদ্রুম গিয়েছিল সিংহলে। ফা হিয়ানের বিবরণে তাম্রলিপ্তিকে দেখতে পাওয়া যায় বৌদ্ধদের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে আর উন্নত বন্দর হিসেবে। কিন্তু সে গৌরবের যুগ বেশীদিন থাকল না। 'বেলাকূল' তাম্রলিপ্ত সমুদ্র থেকে দূরে পড়ে গেল। আজ পাঁশকুড়ায় নেমে ১৬ মাইল বাসে করে এসে রূপনারায়ণের পশ্চিম পারে যাকে দেখা যাবে—সে অতীতের তাম্রলিপ্তি নয়, বর্তমানের তমলুক।

মেদিনীপুরের আরেকটি মহকুমা শহর হল কাঁথি। কাঁথি রোড

স্টেশন থেকে ৪০ মাইল ভিতরে এই শহর। কাঁথি থেকে সমুদ্রের দূরত্ব মাত্র পাঁচ মাইল। স্বাস্থ্যকর স্থান হিসেবে কাঁথির প্রসিদ্ধি। এখান থেকে দীঘার দূরত্ব খুব কম। দীঘা একটি ছোটো গ্রাম। কিন্তু দীঘার সমুদ্রসৈকত সৌন্দর্যপিপাসুদের মুগ্ধ করেছে। পশ্চিম বাঙলা সরকারের সহায়তায় দীঘা খুব দ্রুত সমুদ্র-আবাস হয়ে উঠছে।

অন্য আর-একটি মহকুমা শহরের নাম ঝাড়গ্রাম। খড়্গপুর থেকে ১৪ মাইল দূরে উত্তর-পূর্ব রেলপথের (অধুনালুপ্ত বি. এন. আর) উপর এই শহর অতি সম্প্রতি স্বাস্থ্যকর স্থান হিসেবে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর। রেল-লাইন পাতার পর ঝাড়গ্রাম উন্নত হয়েছে। তার আগে এ অঞ্চল ছিল বনাকীর্ণ।

ঘাটাল মেদিনীপুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-কেন্দ্র। ঘাটালের সুতী ও তসরের কাপড়, কাঁসার বাসন, মাটির জিনিস প্রসিদ্ধ।

হিজলী মেদিনীপুরের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। রসুলপুর নদীর ধারের এই গ্রাম কাঁথি থেকে উনিশ মাইল দূরে। তমলুকের যখন পতন ঘটল তখন উত্থান হল হিজলীর। বহুদূরদূরান্তর, দেশ-দেশান্তরের বাণিজ্যের যোগকেন্দ্র এই হিজলীতে পর্তুগীজরা প্রথম আসে। বাণিজ্যের পত্তন করে তারা গীর্জা তৈরী করল। দেখতে দেখতে এল ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ। তখন বড়ো বড়ো জাহাজ সহজে যাতায়াত করত।

কাউখালিতে লাইট-হাউস তৈরী হয় ১৮১০ সালে। ভাগীরথীর উপর এই-ই প্রথম লাইট-হাউস। ক্ষীরপাইয়ে বিদেশী বণিকদের কুঠি ছিল। এর পাশে বীরসিংহ গ্রামে বাংলার নতুন যুগের পুরোহিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান।